২য় খণ্ড

অপসংস্কৃতির বিভীষিকা

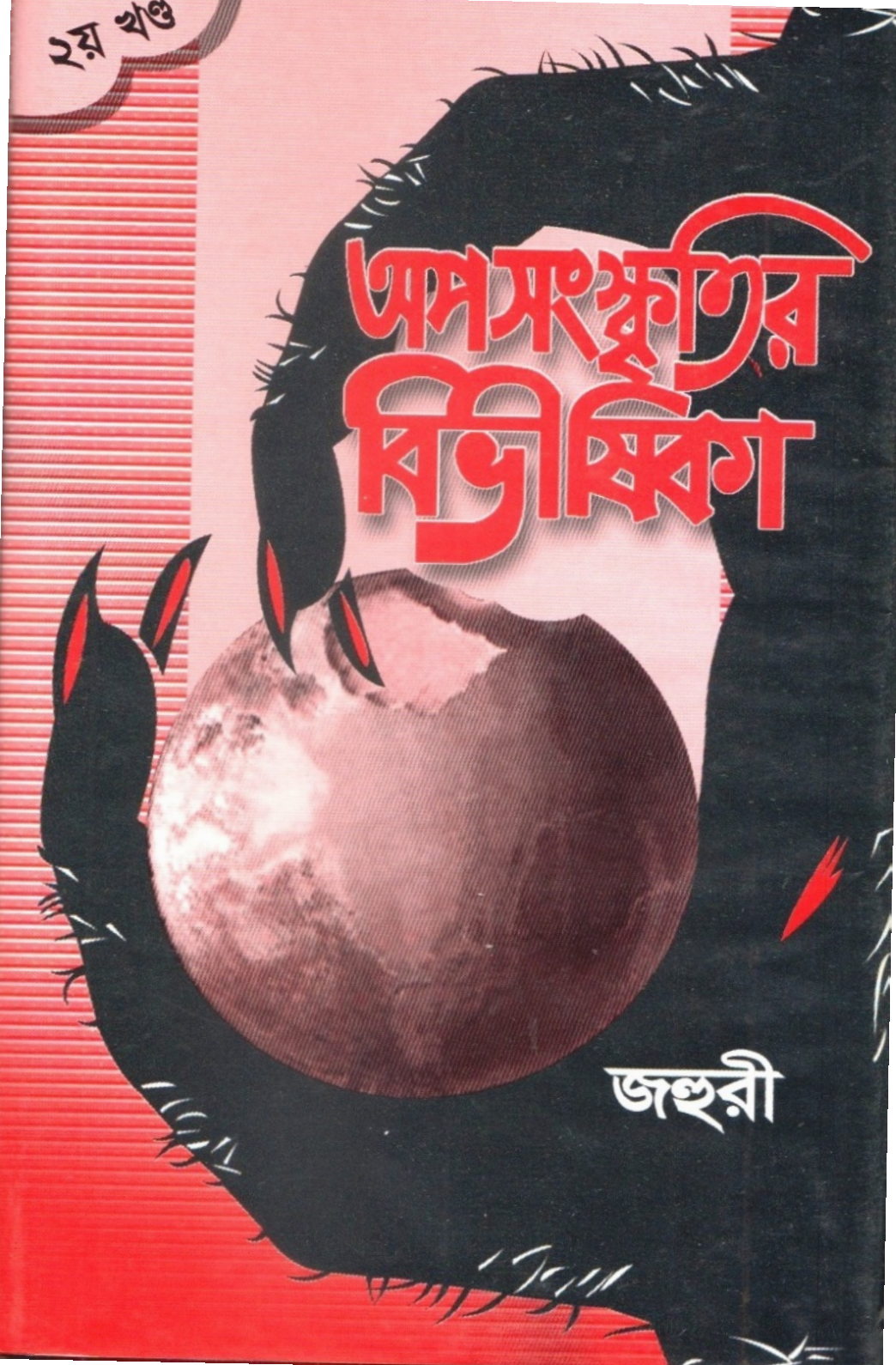

জহুরী

অপসংস্কৃতির বিভীষিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

জহুরী

রেদোওয়ান প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ২য় খণ্ড

প্রকাশিকা : মোসাম্মাৎ মুর্শিদা খাতুন
পূর্ব ক্যানাল পাড়
খাজানগর, জগতি
জেলা-কুষ্টিয়া।

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৩

কম্পোজ : তাসনিয়া কম্পিউটার
৪৩৫, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ : সাইফুল ইসলাম

বাঁধাই : ভাই ভাই বুক বাইন্ডার্স
৪৭, গ্রীনওয়ে বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৮০.০০ (টাকা)

[সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
[illegible]

খুররম মুরাদ

যাঁকে আমি দেখেছি বহুবার, যার সান্নিধ্যও লাভ করেছি,
যাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে খুব কম, কিন্তু
যাঁর ভালবাসা পেয়েছি প্রচুর,
যাঁর চরিত্রের স্নিগ্ধ ও পবিত্র ছায়া করেছে আমাকে ধন্য
তিনি আজ পরপারে, জান্নাতুল ফেরদাউসে,
এই তোহফা তাকেই,
তারই স্মরণে

www.nagorikpathagar.org

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (প্রথম খণ্ড)
২। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)
৩। জহুরীর জাম্বিল (প্রথম খণ্ড)
৪। জহুরীর জাম্বিল (দ্বিতীয় খণ্ড)
৫। মস্তানদের জবানবন্দি
৬। তথ্য সন্ত্রাস
৭। খবরের খবর
৮। প্রেস্টিজ কনসার্ণড
৯। তিরিশ লাখের তেলেসমাত
১০। ক্রিতদাসের মত যাদের জীবন
১১। ধূম্রজালে মৌলবাদ
১২। স্বজন যখন দুশমন হয়
১৩। শব্দ সংস্কৃতির ছোবল

প্রকাশিতব্য বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (তৃতীয় খণ্ড)
২। জহুরীর জাম্বিল (তৃতীয় খণ্ড)
৩। হিতে বিপরীত
৪। তুচ্ছ ঘটনার ভয়াবহ ফল
৫। সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য
৬। জাত নিয়ে ভ্রান্তি-বিলাস

www.nagorikpathagar.org

নাগরিক পাঠাগার

প্রকাশিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ। জহুরী সাহেবের লেখা পুস্তক অপসংস্কৃতির বিভীষিকা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অপসংস্কৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে। এ ময়দানে তো আছেই, আমাদের প্রত্যেকের ড্রয়িংরুমেও প্রবেশ করেছে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে। পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যেও চলছে অপসংস্কৃতিরই রাজত্ব। অপসংস্কৃতির চতুর্মুখী হামলার মোকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতির অবস্থান কোথায়, তা রীতিমত গবেষণা সাপেক্ষ।

এই পুস্তকে জহুরী সাহেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কোন্ কোন্ অপসংস্কৃতি কোন্ কোন্ ভাইরাস ছড়াচ্ছে এবং কিভাবে ছড়াচ্ছে। ওদের মোকাবিলায় আমাদের কি করা উচিত, এ তাগাদাও রয়েছে প্রতিটি আলোচনায়। এখনই প্রতিরোধ না করলে পরিণতি কি দাঁড়াবে, তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। পাঠকপ্রিয়তা প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ড বেশি পাবে বলে আমি মনে করি। কবুল করার মালিক আল্লাহ। তার রহমতের ওপর ভরসা করে প্রকাশনায় হাত দিলাম।

মোসাম্মাৎ মুর্শিদা খাতুন

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

অপসংস্কৃতির বিভীষিকা প্রথম খণ্ড প্রকাশের কিছু দিন পরই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। এরই মধ্যে প্রথম খণ্ড চার বার মুদ্রণ হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে হয়তো পঞ্চম বার মুদ্রণের প্রয়োজন হতে পারে। যা হোক, বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পার হয়ে অপসংস্কৃতির বিভীষিকা দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের হাতে পৌছাতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা তৃতীয় খণ্ডের কাজও সম্পন্ন। শিগগিরই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পাঠকদের কাছে কেমন লাগবে, তা আমি জানি না। তবে প্রথম খণ্ডের ক্ষেত্রে যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছি, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। তবে আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ড পড়তে ভাল লাগবে এবং প্রথম খণ্ডের চেয়েও অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেশি পাবে বলে মনে করি। বিষয়সূচি দেখলে এবং কয়েক পৃষ্ঠা পাঠক করলেই পাঠকগণ বুঝতে পারবেন।

ভাষার ক্ষেত্রে আমি রম্য স্টাইলকে প্রাধান্য দিয়েছি। রম্য স্টাইলে লেখা আমার সহজাত স্বভাব বলে তা থেকে মুক্ত থাকতে পারিনি। কঠিন বিষয়কে পাঠকের বোধগম্য করে তোলার জন্য এ স্টাইলের বিকল্প নেই। অপসংস্কৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এবং প্রতিপক্ষের জবাব দিতে গিয়ে কখনো কখনো তাদের ভাষায় বাধ্য হয়ে আমাকে জবাব দিতে হয়েছে, এই দিকটা পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে খুশি হবো।

আল্লাহর রহমত তো অবশ্যই, তবে জনাব আব্দুর রব, জনাব আব্দুল হান্নান আর দৈনিক সংগ্রামের লাইব্রেরি সহকারী জনাব শাহাদাত হোসেনের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ হয়তো সম্ভব হতো না। এই তিনজন এবং প্রকাশিকাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য জানাই মোবারকবাদ। আমি তাদের কাছে ঋণ হয়ে থাকলাম।

জহুরী

স্থায়ী ঠিকানা
গ্রাম ও ডাকঘর-কদমরসুল
থানা-গোলাপগঞ্জ
জেলা-সিলেট

যোগাযোগ ঠিকানা
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

www.nagorikpathagar.org

একমাত্র পরিবেশক

তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১, বড় মগবাজার

ওয়ারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩৫৪৩৬৮

মোবাইল : ০১৭২-০৪৩৫৪০

www.nagorikpathagar.org

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
কেশ সংস্কৃতি	৯
পরচুলা সংস্কৃতি	১৭
মডেলিং ও ফ্যাশন সংস্কৃতি	২৫
মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি	৩৪
ভ্যালেন্টাইন সংস্কৃতি	৫৬
অসুন্দর চরিত্রের সুন্দরী প্রতিযোগিতা	৭৩
বাংলা নববর্ষ বরণ	৯৮
বাংলা নববর্ষ আর পান্তা ভাত	১১৩
বর্ষবরণের আকর্ষণ : বটতলায় বস্ত্রহরণ	১২১
ইংরেজি নববর্ষ বরণ	১২৮
অসবর্ণ সিঁদুরে বষন্ত বরণ	১৫১
এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি	১৫৭
কিছু তথ্য	১৬৫

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার

কেশ সংস্কৃতি

[কেশ বিন্যাস নারীর অধিকার, কেশ ফ্যাশন সে অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যে কোন স্টাইলে সে সাজতে পারে, যে কোন স্টাইলে চুলের ফ্যাশন করতে পারে, যে কোন খোঁপা সে বাঁধতে পারে, কিন্তু সবই হতে হবে স্বামীর ভোগের সীমানার মধ্যে। এ সীমানা যে লংঘন করবে, সম্ভ্রমের পবিত্রতা সে হারাবে, আর তা হারালে এ মহিলা আর পবিত্র থাকে না। তখন পতিতা আর তার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। মুসলিম ললনারা কেশ সংস্কৃতির চৌহদ্দি লংঘনের কোন অধিকার রাখেন না। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) তাদের সে অধিকার দেননি। একমাত্র স্বামীই নিজ স্ত্রীর সব সৌন্দর্য ভোগকারী, অন্য কেউ নয়।]

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষায় চুলের কয়েকটি প্রতিশব্দ আছে। যেমন কেশ, চিকুর, কুন্তল, অলক ইত্যাদি। তবে আটপৌরে আলাপ-আলোচনায় 'চুল' শব্দের ব্যবহারই বেশি হয়। কেশ, চিকুর, কুন্তল, অলক প্রভৃতি শব্দ আলাপ-আলোচনায় ব্যবহার হয় না, গল্পে, উপন্যাসে আর কবিতায়ই এসব শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কাব্যিক ভঙ্গিতে যারা ডায়লগ ছুঁড়েন বা ভালবাসার পত্র লেখেন, তারা চুলের প্রতিশব্দগুলো ব্যবহার করেন। চুলের প্রতিশব্দগুলোর প্রায় সবই নারীর চুল সম্বোধনে, নারীর দখলে।

চুল আছে পুরুষের মাথায়, চুল আছে নারীর মাথায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, কার দেহে সবচেয়ে বেশি চুল, পুরুষের না নারীর? তাহলে যে কোন জন উত্তরে বলবেন, পুরুষের দেহে চুল বেশি, লম্বা-খাটো চুলের প্রশ্ন ভিন্ন। চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে চুল। মাথায় চুলবিহীন পুরুষের চেহারা খুব একটা বেমানান হয় না, কিন্তু চুলবিহীন মাথার নারীর চেহারা বড্ড বেমানান। পুরুষ-দেহের মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি, এমনকি এর নীচ পর্যন্তও চুল বিভিন্ন নামে পরিবৃত থাকা সত্ত্বেও পুরুষের চুল নিয়ে গল্পে, উপন্যাসে বা কাব্যে কোন আলোচনা হয় না, যত আলোচনা সবই হয় নারীর চুল নিয়ে। অথচ পুরুষের চুল নিয়ে আলোচনা তো বেশি হওয়া উচিত ছিল। পুরুষের মাথায় চুল, ভ্রুতে চুল, মুখে চুল (দাঁড়ি গোঁফ), বুকে চুল অর্থাৎ সর্বাঙ্গে চুল। বুকের আর মুখের চুল তো পুরুষের এক চেটিয়া। তবুও পুরুষরা নিজেদের চুল নিয়ে কোন কাব্য করে না, কোন আলোচনা করে না, নারীর চুল নিয়ে পুরুষরাই কবিতা লেখে, যেখানে যে প্রতিশব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেই প্রতিশব্দ দিয়ে নারীর চুলের বর্ণনা দেয়। নজরুল সাহিত্যে কেশ, রবীন্দ্র সাহিত্যে কেশ, মধুসূধনের সাহিত্যে কেশ অর্থাৎ নারীর কেশ অজস্রবার আলোচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষরা সারা অঙ্গের সর্বত্র এত চুলের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে নারীকে এই স্বত্ব ভোগের একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হলো? এর উত্তর হতে পারে এই, পুরুষরা নারীকে সুন্দর দেখতে চায়, তাই কসমেটিক্সের প্রায় সবই নারীদের জন্য তৈরি হয়। ল্যাটিন শব্দ কসমস থেকে কসমেটিক্সের উদ্ভব।

হ্যাঁ, নারীর মুখমণ্ডলে যদি পুরুষের মত দাঁড়ি-গোঁফ জন্ম নিত, তাহলে চেহারা-বিলাসের জন্য নারীর ড্রেসিং টেবিলের ব্যবহার আর কসমেটিক্সের বাহারী ব্যবহারেরও প্রয়োজন হতো না। তাদের মুখমণ্ডল দাঁড়ি-গোঁফ থেকে মুক্ত থাকার কারণে নারীদের সকল মনোযোগ মাথার কেশদামের রকমারি বিন্যাস এবং

www.nagorikpathagar.org

বিলাসিতার ওপর নিবদ্ধ। চোখের উপরে যে ভ্রু, তাই রাখেন না অনেক নারী, ব্লেড দিয়ে সাফ করে দেন ভ্রু অথবা উপড়িয়েও ফেলেন। তাদের দাঁড়ি-গোঁফ থাকলে কি যে করতেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এ জন্য বোধহয় বিধাতা তাদের দাঁড়ি-গোঁফই দেননি।

বিশ্বে কয়েক কোটি পুরুষ আছে, যারা নারীর মাথার চুলের সেবায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত। তারা নারীর কেশদাম বিন্যাসের মাল-মসলা ও উপকরণাদি তৈরিতে, সংগ্রহে, যোগানে, সরবরাহে, বিপণনে সর্বদা ব্যস্ত রয়েছেন। শিল্প-কারখানা এ জন্যে গড়ে তুলেছেন, বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করছেন, আবিষ্কারে ব্যস্ত রয়েছেন।

পুরুষরা নিজেদের মাথার চুলে প্রায়ই যত্নবান নন। যে সব পুরুষ নিজেদের মাথার চুলের ব্যাপারে কিছুটা যত্নবান, তারাও ড্রেসিং টেবিলের সামনে মাত্র এক বা দু'মিনিট দাঁড়িয়ে চিরুনী ব্যবহার করেন, কেউবা আয়নার সামনে দাঁড়াবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কেউ মাথায় তেল দেন, কেউ দেন না। কিন্তু নারীরা নিজেদের চুলের ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নন। দিনে কয়েকবার না হলে দু'একবার তো তারা আয়নার সামনে বসে অবশ্যই চেহারা দেখেন, চুলের যত্ন নেন, বিন্যাস করেন। মেয়েদের সুবাসযুক্ত তেল শত শত ব্রান্ডের। কেশ বিন্যাসে যারা সুবাসিত তেলের প্রয়োজন বোধ করেন, তারা পছন্দ মত কোন না কোন ব্রান্ডের তেল ব্যবহার করেন। তাদের আকৃষ্ট করার জন্য তেলের নামও রাখা হয় নারী ঘেঁষা। যেমন- লক্ষ্মী বিলাস, হিমকবরী, কুন্তল কুসুম ইত্যাদি।

প্রথমে পুরুষের মাথার চুলের ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোচনা করা যাক। যদিও পুরুষের আপাদমস্তক বিভিন্ন নামে চুলে ভর্তি, কোন কোন পুরুষের পিঠে পর্যন্ত চুল, বাদ শুধু হাত ও পায়ের তালু, কিন্তু পুরুষরা চুলের রকমারি আলোচনা থেকে বঞ্চিত। তবে পৃথিবীর সকল পুরুষ চুলকে যে উপেক্ষা করেন, এ কথা বলা যাবে না। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন ঝিনাইদহের এক মুসলিম ভদ্রলোকের শখ হয় লম্বা দাঁড়ি রাখার। তিনি তার মুখের দাঁড়ি বাড়াতে থাকেন। ৮৫ বছর বয়সে তার দাঁড়ির দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৪৮ ইঞ্চি। ১৯৭৭ সালের ২৫ অক্টোবরের এক বাংলা দৈনিকে তার দাঁড়ি রাখার কাহিনী ও ছবি ছাপা হয়। তার নাম জনাব আরশাদ আলী বিশ্বাস। ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার তেলটুপ গ্রামের বাসিন্দা তিনি। তিনি বোধহয় এখন জীবিত নেই। তিনি দাঁড়ির খুব যত্ন নিতেন। গোসলের সাবান দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

গোসলের সময় প্রতিদিন দাঁড়িতে সাবান লাগিয়ে পরিষ্কার করতেন। দাঁড়িতে আতর লাগাতেন। সেই ভদ্রলোকের ছবি আমার কাছে আছে।

নরওয়ের নাগরিক হান্স ল্যাংসেথ জন্মেছিলেন ১৮৪৬ সালে। তার দাঁড়ির মাপ ছিল ১৭.৫ ফুট লম্বা। হ্যান্সের মৃত্যুর পর তার বিশ্ব রেকর্ডধারী দাঁড়িগুচ্ছ ওয়াশিংটনের স্মিথ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনে জমা রাখা হয়েছে (১/৪/২০০০ দৈনিক ইনকিলাব)।

১৯৯৩ সালের ২রা ডিসেম্বর দৈনিক খবরে এক লোকের গোঁফের ছবি ছাপা হয়। তার ছবি এখনও আমার ফাইলে আছে। রেকর্ড গড়ার নেশায় কালিয়ারাম বড় করেছেন তার এক জোড়া গোঁফ। লম্বা মোচওয়ালা হিসাবে তিনি ইতোমধ্যে পরিচিতিও পেয়েছেন বিশ্বে। ৬৪ বছর বয়স্ক রাম পেশায় একজন নাপিত। বাড়ি ভারতে। নিজের সেলুন আছে। সকলের মোচ ছেঁটে জীবিকা উপার্জন করলেও নিজের গোঁফ জোড়াকে বাড়িয়ে তুলেছেন সযত্নে। তার দু'টি মোচ সমান লম্বা নয়। বাম পাশেরটি ১শ' ৩৭ সেঃ মিঃ। আর ডানেরটি ১শ' ৬০ সেঃ মিঃ। ঘুমানো, গোসল বা চলাফেরার সময় তিনি মোচ জোড়া কানের সাথে পেঁচিয়ে রাখেন। লম্বা মোচ নিয়ে তার কোন অস্বস্তি নেই, (সৌজন্যে আল ওয়াতন পত্রিকা)।

পাকিস্তানের আর এক মোচওয়ালা, তার অস্বাভাবিক লম্বা মোচ দিয়ে মোটর সাইকেলের গতিকে আটকিয়ে রাখতে পারতেন। ঢাকায় তিনি এসে মোচ দিয়ে কি কি করতে পারেন, তা প্রদর্শন করেছেন। দাঁড়ি গোঁফের আরও অনেক কথা আছে, বিচিত্র মানুষ আছে। দৃষ্টান্ত বাড়াতে চাই না।

বাংলাদেশের এক শ্রেণীর যুবক কেশ-বিলাস করে থাকেন। মাথার চুল কেউ কেউ লম্বা করে খোঁপা বাঁধেন, কেউ কেউ শুধু লম্বা করেন মেয়েলোকের চুলের মত, কিন্তু খোঁপা বাঁধেন না। কেউ কেউ সামনের চুল খাটো করে রাখেন, কিন্তু পিছনের চুল বাড়াতে থাকেন। মাথার চুল কেউ খাটো করে রাখেন, কেউবা একটু লম্বা রাখেন। পুরুষদের মাথার চুলের কাটিং এক সময় ছিল দিলীপ কাটিং, উত্তম কাটিং। অর্থাৎ অভিনেতা দিলীপ কুমার ও উত্তম কুমারের চুলের কাটিংয়ের অনুরূপ। আজকাল তাদের অনুকরণের কাটিং নেই বললেই চলে। দুই দশক আগেও কলেজ স্টাইল ও ইউনিভার্সিটি স্টাইল কাটিং চালু ছিল, আরো ছিল ট্রাভেলটাকাট, ফিদারকার্ল, আফ্রোকার্ল, লেদার কার্ল কাটিং। আজকাল বিশেষ

www.nagorikpathagar.org

কোন স্টাইল নেই, যা আছে প্রচলিত তাহলো ফ্রি স্টাইল। যার মন যেমন চায়। তবে অধিকাংশ যুবক মাথার সম্মুখের চুলকে লম্বা হতে দিচ্ছেন না, যত বাড়ে বাড়ুক পিছনের দিকে।

অভিজাত পরিবারের যুবকরা যে সব সেলুনে গিয়ে মাথার চুল কাটান, এমন একটি প্রথম শ্রেণীর সেলুনের নর সুন্দরের সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাহলো এই, নরসুন্দর বললেন : অনেকের চেহারার দিকে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি, চুলের কি কাটিং তাকে মানাবে। সে অনুযায়ী কাজ শুরু করতে পারি, কিন্তু তরুণ-যুবকদের ক্ষেত্রে প্রায়ই বাধা আসে। কোন কোন যুবক চেয়ারে বসেই বলে দেন, তিনি কি কাটিং চান। কিন্তু সমস্যা হলো এই, প্রত্যেকের মাথার চুল এক প্রকৃতির নয়। কারো পাতলা, কারো ঘন, কারো খাড়া চুল। মাথার সাইজও কিন্তু সকলের এক রকম নয়। সুতরাং কাস্টমারের চাহিদা মাফিক কাটিং করতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রে আমাদের হিমশিম খেতে হয়। কাউকে বুঝিয়ে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাই, আবার কারো কারো ব্যাপারে আমাদের পছন্দ কাজে লাগে না, কাস্টমারের পছন্দ মত চুলের কাটিং করতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করি। আমাদের কাছে আছে পুরুষের মাথার চুলের বিভিন্ন কাটিংয়ের ছবি। এ সব ছবি দেখিয়ে আমরা বলি, মডেল আপনি পছন্দ করেন। তিনি মডেল পছন্দ করেন, আমরা তার পছন্দের কাটিং গড়ে তুলি। এ ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। ধরুন, ছবিতে আছে মোটা গর্দান ও ঘন চুলের মাথা। কাস্টমারের চিকন গর্দান এবং মাথার সেপও ভাল নয়, চুলও মাথায় কম, অথচ তিনি মোটা গর্দানের আর সুন্দর মাথার ঘন চুলের কাটিং পছন্দ করে বসলেন, তখন আমরা বেকায়দায় পড়ি। নর সুন্দর বললেন, এমন সমস্যার সম্মুখিন হই খুবই কম। অধিকাংশ কাস্টমার বসেই নির্দেশ দেন, কাটিং স্টাইলের কথা কমই বলেন। আজকাল আমরা বিভিন্ন স্টাইলের চুলের কাটিং ভুলতে বসেছি। আগে আমরা চুল কাটতাম সামনের চুলকে ষোলআনা স্ট্যান্ডার্ড ধরে। ধীরে ধীরে আনা আনা করে পিছনের দিকে চুল কমাতে হতো। মাথার চতুর্দিকে প্রান্ত সীমার চুল দক্ষতার সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিতে হতো। আজকাল এসব মিলামিলির কারবার নেই। দীর্ঘ ক্ষণ কাঁচি আর চিরুনী দিয়ে ক্যাচর ক্যাচর শব্দ করে মাঝে মাঝে দু'এক পুছ দেয়া, বারবার চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ানো আর বিদায় দেয়ার সময় মাথা-ঘাড় ম্যাসেজ করে দেয়াই হচ্ছে অভিজাত হেয়ার কাটিং। দশ বিশ বার কাঁচি ক্যাচর ক্যাচর করে একবার চুলের অগ্রভাগ কর্তন করলেই অনেক যুবক খুশি থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

এসব যুবকের কোন কোন অভিভাবক এসে নালিশ করেন, কি ভাই যেমন ছিল আগে, এখনও আছে তাই, কি চুল কাটলেন? আমরা জবাব দেই, আধুনিক কাটিং, যেমন পছন্দ তেমন কাটিং। অভিভাবক মাথা নেড়ে আফসোস করে চলে যান। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

মেয়েলোকের মত যারা লম্বা চুল রেখেছেন, তাদের মাথার চুলের তো কোন কাটিংই হয় না। তবুও লম্বা চুলের শেষ প্রান্তের অগ্র ভাগে কাঁচি চালাতে হয়। সময়ক্ষেপণ করার জন্য কিঞ্চিৎ কর্তন করতে হয়। এমন চুলের কাটিং নিয়ে আমাদের ভাবতে হয় না। তবে অনেক যুবক আর যুবতীর মাথার চুলের সাইজ একই অর্থাৎ বব কাটিং।

নরসুন্দর আরো অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি বললেন, চরিত্রহীন যুবকরা সাধারণত আমাদের দ্বারা চুল কাটায় না, এমনকি দাঁড়িও সেভ করায় না, তারা চলে যায় পার্লারে। নারীদের হাতে কাজ করায়, চুল কাটায় এবং শরীর ম্যাসেজ পর্যন্ত করায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের (পুরুষ) কারো কারো মাথায় দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের ও নমুনার চুল। কারো মাথায় দেখা যায় সুপারি গাছের ফুলের মত চুল, কারো মাথায় ঝটা করা চুল, কারো মাথার তালুতে দেখা যায় কিছু চুল। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীরা ঝটা পাকিয়ে মাথায় চুল রাখেন, কেউ কেউ শুধু লম্বা চুল রাখেন। যার পছন্দ যেমন, মাথার চুলের বিন্যাস করেন তেমন। তবে এ কথা সত্য, যদিও দেশ-বিদেশের অনেক পুরুষ তাদের মাথায় নানা স্টাইলে চুল রাখেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা নারীর তুলনায় অতি নগণ্য মাত্র।

ইউরোপ, আমেরিকা, বৃটেন, জাপান এবং শিল্পন্নোত দেশের নারীরা তাদের মাথার চুল নিয়ে প্রাচ্য দেশের ললনাদের মত চুল বিলাসিতা প্রায়ই করেন না। সে সব দেশের নারীদের মাথায় যত লম্বা চুল দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় বব কাটিং চুল। তাই রকমারি খোঁপার ঝামেলা তাদের করতে হয় না। জাপানেও লম্বা চুলের মহিলা খুবই কম দেখা যায়। সে সব দেশের নারীদের অধিকাংশের মাথায় খাটো চুল থাকার কারণে কেশ ফ্যাশনে তারা খুব বেশি আগ্রহী নন। এ কারণে তাদের মাথার চুল তাদের সাহিত্যে কাব্যে খুব বেশি আলোচিত নয়। শুধু সোনালী বর্ণের চুলের প্রতি কবি-সাহিত্যিকদের পছন্দের পাল্লা ভারী দেখা যায়। চুল নিয়ে যত বিলাসিতা, ফ্যাশন আর সাজসজ্জা প্রায় সবই এই

www.nagorikpathagar.org

উপমহাদেশের নারীরাই করে থাকেন। বাংলাদেশী মেয়েদের কথাই এখানে আলোচনা করি। বাংলাদেশী মেয়েদের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগের মাথায় লম্বা চুল। এ জন্য চুল-ফ্যাশনের প্রতি তারা বেশি আগ্রহী। চুল দিয়ে খোঁপা বাধার রেওয়াজ আজকাল আধুনিক পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বেশ হ্রাস পাচ্ছে, তবুও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় খোঁপাওয়ালী মেয়ে আর মহিলা বেশি। নানা জাতের খোঁপা, যেমন বিড়া খোঁপা, তারা খোঁপা, রিং খোঁপা, বেলী খোঁপা, চম্পাকলি খোঁপা, বিনুনী খোঁপা ইত্যাদি। মহিলারাও সেলুনে গিয়ে চুল কাটান। আত্মীয় বাড়ি, বান্ধবীর বাড়ি, সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে অনেকে চট করে চলে যান পার্লারে। সেখানে গিয়ে ইউসেপ, বয়কাট, ব্যাক কম্বিং চুলের কাটিং করেন। পনি টেইল কেশ বিন্যাসও করে থাকেন। এ পর্যন্ত কেশ বিন্যাসের বত্রিশ ধরনের স্টাইল প্রচলিত। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা কততে গিয়ে দাঁড়াবে, তা জানি না। যার যে স্টাইল ভাল লাগে সেই স্টাইলে চুলের বিন্যাস করা হয়। খোঁপার স্টাইলই হরেক রকমের। আগে কিছু উল্লেখ করেছি, এবার বঙ্গীয় কায়দায় বলছি, অশ্বলেজী খোঁপা, মোরগ পুচ্ছ খোঁপা, ময়ূরীর পেখম তোলা খোঁপা, চুলের বিনুনী দিয়ে জোড়া খোঁপা, বেণী খোঁপা, মাথার তালুতে উটের পিঠের মত চুড়া খোঁপা, মাথার পিছনে টাইট খোঁপা, হেলিয়ে পড়া খোঁপা। দিনে যে সব মহিলার হাজার দু'হাজার টাকা আয়, তারা ঘর থেকে বের হয়ে পার্লারে প্রবেশ করেন। পার্লার থেকে খোঁপা করে নানা গন্তব্যের পথ ধরেন। নানা মনযিলে যান। তারা বিভিন্ন ধরনের খোঁপা করেন, যখন যেটা পছন্দ হয় সেটা করেন। ধরুন আজ নিলেন চুড়া খোঁপা, কাল নেবেন অশ্বলেজী খোঁপা, অন্যদিন নেবেন চম্পাকলি খোঁপা।

আমি এতক্ষণ যে সব মহিলার মাথার চুল ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করলাম, সে সব মহিলা আওয়ারা, বেপর্দা, ফ্যাশন বিলাসী আর দশের নজরে চেহারা প্রদর্শনকারী মহিলার কথা বললাম। মেয়েরা সাজবে, চেহারাকে সুন্দর করবে, নানা সুবাসে সুবাসিত হবে, নিজের চেহারা এবং দেহকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে তুলবে, কিন্তু বাজারে বিকিকিনির জন্য নয়, দশজনের নজর কাড়ার জন্য নয়, অশ্লীল মন্তব্য শোনার জন্য নয়, সব হতে হবে শুধু নিজের স্বামীর জন্য। ইসলাম নারীদের সব রকমের সাজসজ্জার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু একটি বাধা দিয়ে রেখেছে স্বামীকে সামনে দাঁড় করিয়ে। এ সীমা কোন মুসলিম মহিলা লংঘন করতে পারবে না। সীমা লংঘন করলে মহিলাটি নিজের রূপ ও দেহকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে দশের হাপিত্যেস লোভের খোরাকে পরিণত হবে। শুধু দেহ বিকিকিনি

www.nagorikpathagar.org

করলেই যে বেশ্যা বা পতিতা হয়, তা নয়। রূপ-সৌন্দর্যকে অন্যের উপভোগে নিলেও পরোক্ষভাবে পতিতায় শুমার হয়। নেংটা হয়ে যে নারী নৃত্য করে, তার দেহকে কোন দর্শক সরাসরি ভোগ করতে পারে না। তবে তার দিগম্বর দেহখানা যৌন লালসার দ্বারা যে ভোগ করা হয়, তাতো অস্বীকার করা যাবে না। কাপড় পরেও যে যুবতী চেহারাকে নানা সাজে সাজিয়ে তোলে হাস্যে-লাস্যে চলাচলে, নানা ছন্দে নানা ভঙ্গি করে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলে, তাদেরও কেউ সরাসরি ভোগ করতে পারে না (দুর্ঘটনা ব্যতিক্রম) কিন্তু এই মহিলা দেহ ছাড়া আরতো সবই দিল, স্বামীর জন্য রাখলো কি? এ ধরনের মহিলাও এক ধরনের পতিতা। অভিনয় করতে গিয়ে পর পুরুষের কোলে বসে, বাহুডোরে আবদ্ধ হয়, বুকে জড়িয়ে ধরে, এমন মহিলারাও স্বামীর জন্য আর কি বাকি রাখলো? যা বাকি রাখলো বলে মনে করেন, তাও হয়তো বাসায় ফেরার আগে নায়ককে দিয়েও আসতে পারে। বলতে পারে, সবই যখন দিলাম, তখন এটাও তুমি নাও। শত শত ঘটনা এভাবেই ঘটছে।

কেশ বিন্যাস নারীর অধিকার, কেশ ফ্যাশন সে অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যে কোন স্টাইলে সে সাজতে পারে, যে কোন স্টাইলে চুলের ফ্যাশন করতে পারে, যে কোন খোঁপা সে বাঁধতে পারে, কিন্তু সবই হতে হবে স্বামীর ভোগের সীমানার মধ্যে। এ সীমানা যে লংঘন করবে, সম্ভ্রমের পবিত্রতা সে হারাবে, আর তা হারালে এ মহিলা আর পবিত্র থাকে না। তখন পতিতা আর তার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না।

মুসলিম ললনারা কেশ সংস্কৃতির চৌহদ্দি লংঘনের কোন অধিকার রাখেন না। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) তাদের সে অধিকার দেননি। একমাত্র স্বামীই নিজ স্ত্রীর সব সৌন্দর্য ভোগকারী, অন্য কেউ নয়।

www.nagorikpathagar.org

পরচুলা সংস্কৃতি

['যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের ফেডারেল এজেন্সি পরচুলা বিক্রির ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করে টাকওয়ালাদের কৃত্রিম উপায়ে মাথায় নতুন চুল সুশোভিত করার দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা এবার চূড়ান্তভাবে শুধু পিছিয়েই যায়নি, এ সংক্রান্ত প্রচেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়। এজেন্সি বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। বিজ্ঞাপনের দাবি অনুসারে কৃত্রিম উপায়ে পরচুলায় মস্তক শোভিত করা যায় বটে, কিন্তু এতে প্রাকৃতিকভাবে পড়ে যাওয়া চুল কিংবা টাকের কোন উপকার হয় না। বাজারে যে হাজার হাজার পরচুলা পাওয়া যায়, তা ব্যবহার যেমন কষ্টকর, তেমনি ব্যয়বহুল এবং মানসিক শান্তিও ব্যবহারকারী পায় না, অধিকন্তু মারাত্মক ব্যাধি জন্ম নেয়। এজেন্সি জানিয়েছে, তারা তিনশ'-এর বেশি পরচুলা ব্যবহারকারী থেকে অভিযোগ পেয়েছেন। তাদের কারও মুখ ফুলে গিয়েছে, কেউ কেউ মাথা ব্যথায় ভুগছেন, কারও টাকে কাল্‌সিটে দাগ পড়েছে, কারও কারও মাথায় যে সামান্য চুলটুকু ছিল, তাও পড়ে শেষ হয়ে গেছে। কেউ কেউ মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। অথচ আমাদের নবী করিম (সাঃ) ১৪শ' বছর আগে পরচুলা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।]

www.nagorikpathagar.org

পরচুলা হচ্ছে কৃত্রিম চুল বা পরের চুল, যা দিয়ে কেউ কেউ নিজ চুলের অভাব দূর করেন। ইংরেজিতে বলা হয় False or artificial hair, wig, periwig. পরচুলা তৈরি ও ব্যবহারের ইতিহাস খুব প্রাচীন। তবে ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এবং কখন থেকে পরচুলা ব্যবহার শুরু হয়, তা জানা যায়নি। তবে মানবজাতির ইতিহাস বা মানুষের সামাজিক ইতিহাস যে সময় থেকে লেখা শুরু হয়, সে সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় কারো টেকো মাথা বা কারো চুলবিহীন মাথার ছবি ও বর্ণনা। তখন পরচুলা ব্যবহারের আবশ্যকতা চুলবিহীন মাথাওয়ালারা তীব্রভাবে বোধ করতেন না। তবে কেউ কেউ কৃত্রিম আঁশকে কালো করে চুলের মত করে ব্যবহার করতেন, সমাজ বিজ্ঞানীদের লেখা ইতিহাসে এমন বর্ণনাও রয়েছে।

কারো মাথায় ঘন চুল, কারো মাথায় পাতলা চুল, আবার কারো মাথায় চুল নেই, কারো মাথার চারিধারে চুল আছে, কিন্তু মাথার তালুতে নেই চুল। অল্প বয়সেও কারো মাথা দেখা যায় চুলবিহীন। দেহযন্ত্রের যান্ত্রিক কারণে কেউ কেউ জন্ম থেকে এই ব্যাধিতে ভোগেন, আবার কেউ কেউ জন্মের পর বয়সের কোন এক পর্যায়ে রোগে ভোগেও মাথার সব চুল হারান। মাথার চুল পড়ে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ এই সমস্যা সমাধানের জন্য পরচুলা ব্যবহার করেন, কেউ কেউ তা করেন না, চিকিৎসার দ্বারা মাথায় চুল গজিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পরচুলা যারা নিয়মিত ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। সিনেমা-নাটকে যে সব নারী-পুরুষ অভিনয় করেন, তাদের মধ্যে প্রায় অভিনেতা এই অভ্যাসে অভ্যস্ত। বয়স্ক পুরুষরা আলগা দাঁড়ি, গোঁফ প্রায়ই ব্যবহার করেন, নারীরা অনেকেই পরচুলা ব্যবহার করেন তাদের মাথায় চুল থাকা সত্ত্বেও।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরচুলা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও পরচুলা ব্যবহার মোটেই সমর্থন করে না বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের রায় পরচুলা ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। পরচুলা ব্যবহারে নানা সমস্যা আছে। নানা রোগ সৃষ্টি হয়, এমনকি পরচুলা ব্যবহারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। এমন একটি ঘটনা রাজধানী ঢাকায় ঘটেছিল ১৯৮৬ অথবা ১৯৮৭ সালে। পত্রিকায় এই বেদনাদায়ক খবর ছাপা হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবরের শিরোনাম ছিল এই 'নববধূর রহস্যজনক মৃত্যু।' একটি চৈনিক পার্লারে নকল চুলের খোঁপা বেঁধে

www.nagorikpathagar.org

দেয়ার পর বধূটি সেই রাতেই খোঁপার ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত কীটের দংশনে মৃত্যুবরণ করেন। সলাজ বধূ সেই মরণ খোঁপা বাঁধার সময় কোন প্রতিবাদ করেননি। হয়তো ভেবেছিলেন কাঁটার খোঁচা বা ক্লিপের আঘাত। পার্লারের পরিচালিকা তার অপরিচ্ছন্ন শোকেসে দীর্ঘ দিন ফেলে রাখা সেই খোঁপাতে বিষাক্ত কীটের যে চমৎকার ঘরবাড়ি হয়েছে, সে খবর সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এমন ঘটনা আর ঘটেছে কিনা তা জানি না, তবে মৃত্যুর মত মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটলেও পরচুলা ব্যবহারে অনেকে যে নানা ব্যাধিতে ভোগেন, এমন খবর প্রায়ই শোনা যায়। আসুন, আমরা ধর্মীয় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পরচুলা ব্যবহারের দিকটি আলোচনা করে দেখি।

ওহির প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন-অভ্যাস যাদের আছে আর আছে আমল ও চরিত্র, তাদের জিন্দেগীও সেভাবে গড়ে ওঠে। দুনিয়াটা থাকে তাদের তা'বে। এ প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার। নবী রাসূল (সাঃ)দের দৃষ্টান্ত তো আরও উর্ধে। তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে আল্লাহপাকের সাথে। কারণ, আল্লাহই তাদের নবী-রাসূল করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাদের দুনিয়ার জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁরা যে সব আদেশ-নিষেধ করেন বা উপদেশ দিয়ে থাকেন, তা নিজেদের খেয়ালী মন থেকে দেন না। কারণ, তাদের খেয়ালী কোন মন নেই। যে মন তাদের ছিল, সে মন ছিল আল্লাহর কুদরতি বাঁধনে বাঁধা। সুতরাং নবী-রাসূলদের আদেশ-নিষেধ এবং উপদেশ বিনা যুক্তিতে বা কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে মেনে নেন রাসূলপ্রেমিক উম্মতেরা। তবুও ঈমানের মজবুতির জন্য অনেকে যুক্তি তালাশ করেন। ঈমানকে মজবুত করার নেক নিয়তে যদি যুক্তি তালাশ করা হয়, তাহলে যুক্তি তালাশের এই অনুসন্ধিৎসা দোষের নয়। হযরত ইবরাহিম (আঃ) মৃতকে জিন্দা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বলেছিলেন, আমি যে মৃতকে জিন্দা করতে পারি, তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে? ইবরাহিম (আঃ) বলেছিলেন, না তাতে আমার সন্দেহ নেই। একমাত্র আপনার সে শক্তি আছে, সে ঈমান আমার আছে। তবে মৃতকে জিন্দা দেখলে ঈমানটা আরও মজবুত ও পোক্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আমি এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করছি শুধু একটি বিষয় সম্পর্কিত। আমাদের প্রিয় নবীর (সাঃ)-এর একটি নিষেধাজ্ঞাকে ১৪শ' বছর পর মার্কিন বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, রাসূল (সাঃ)-এর ১৪শ' বছর আগের নিষেধাজ্ঞা ছিল সেন্টপার্সেন্ট বৈজ্ঞানিক তথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানভিত্তিক। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল পরচুলা ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। সে হাম রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার মাথার চুল ঝরে গেছে। এখন স্বামীর কোনও আকর্ষণ তার প্রতি নেই। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেব? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায়, তাদের উভয়ের ওপর আল্লাহতায়ালা লানত করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইরাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মুয়াবিয়া (রাঃ) শেষ বার যখন মদীনা আসলেন, তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণ দেয়ার সময় এক গোছা চুল বের করে বললেন, ইহুদী ভিন্ন আর কাউকে আমি এ কাজ করতে (অর্থাৎ পরচুলা ব্যবহার করতে) দেখিনি। নিঃসন্দেহে নবী (সাঃ) এরূপ পরচুলা ব্যবহার করাকে প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আলকামা (রাঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) লানত করলেন এমন সব নারীর ওপর, যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, কপাল প্রশস্ত করার জন্য যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু করে এবং ফাঁক করে, কৃত্রিম উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয়। তখন ইবনে ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেন? আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি কেন তার ওপর লানত করব না, যার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লানত করেছেন এবং আল্লাহর কিতাবেও তাই আছে? ইবনে ইয়াকুব বললেন, আমি সমগ্র কুরআন পড়েছি, কিন্তু তাতে তো আমি এমন পেলাম না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে, তবে আল্লাহর কসম, তুমি তাতে এটা অবশ্যই পেতে, 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা আঁকড়ে ধর আর যা থেকে তিনি বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক'।

www.nagorikpathagar.org

পরচুলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মহিলাটির এই সকরুণ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার হাদীসটি পাঠ করে অনেক পাঠকই হয়তো মর্মাহত হবেন। তারা ভাবছেন, পরচুলা ব্যবহারের অনুমতি দিলে কি এমন ক্ষতি হত। নব বিবাহিতা মেয়েটি রোগাক্রান্ত হয়ে মাথার সব চুল হারিয়েছে। নারীর সৌন্দর্য একান্তভাবে তার স্বামীর জন্য। স্ত্রীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চুল বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে নারী চেহারা ও বর্ণের দিক দিয়ে পরমা সুন্দরী, কিন্তু তার মাথায় চুল যদি না থাকে, তাহলে তার চেহারার সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ঐ বিবাহিতা যুবতী, চেহারার সৌন্দর্য হারায় মাথার চুল পড়ে যাওয়ার কারণে। স্ত্রীর মাথা ভরা চুলে চেহারার যে সৌন্দর্য স্বামী উপভোগ করতো, তা থেকে সে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা তাকে পীড়া দেয়া স্বাভাবিক। এ কারণে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যুবতির মা নিজের মেয়ের এই করুণ অবস্থা দেখে এবং তার মেয়ের প্রতি জামাইর নাখোশ চাহনির বেদনা উপলব্ধি করে পরচুলা ব্যবহারের প্রতি বিকল্প একটা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করাও স্বাভাবিক। মহিলাটির মনে এ ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি পরচুলা ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাহলে এই পরচুলা ব্যবহার করে তার কন্যা স্বামীর সামনে আসলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেকটা ফিরে আসবে। স্বামী সন্তুষ্ট হবেন। দাম্পত্য জীবনে মন কষাকষির কোনও কারণ ঘটবে না। এ ধরনের চিন্তা হয়তো অনেক পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, ঐ বিবাহিতা মহিলার প্রতি প্রবল মমত্ববোধ সৃষ্টি হওয়াও সঙ্গত ও স্বাভাবিক। দুর্বল ঈমানের অনেক পাঠক আরও অগ্রসর হয়ে এ চিন্তাও করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরচুলা ব্যবহারের অনুমতি দিলে এমন কি ক্ষতি হতো?

যে মনগুলো এ ধরনের চিন্তা করে, সে মনগুলো বুঝতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো খেয়ালীভাবে কাউকে কোনও কথা বলেননি বা খেয়ালের বশে কোনও উপদেশ দেননি। তিনি যা বলতেন বা কোনও কিছু করার আদেশ করতেন বা না করার জন্য নিষেধ করতেন, তা রাসূল হিসাবেই আদেশ-নিষেধ করতেন। উম্মতের উচিত, বিনা সংশয়ে তা কল্যাণকর বলে মেনে নেয়া এবং আমল করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

করে যুক্তি তালাশে লেগে যাই। শয়তান এই সুযোগে আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়।

অনেক সময় আমরা খুব বেশি বেশি বুঝে ফেলি। কোন কিছু বুঝার স্বাভাবিক যে চৌহদ্দি আছে, তাও আমরা লংঘন করে ফেলি। 'আমি কি কম বুঝি' এই ইবলিসী অহমিকা অনেক সময় আমাদের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসও আল্লাহর সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেও বুঝাতে চেয়েছিল যে, সে কম বুঝে না। কিন্তু এই বেশি বুঝার বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তার পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল, তা কারও অজানা নয়। অনেক সময় বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে ইবলিসী চরিত্রকে আমরা অনুসরণ করে থাকি। এমনকি 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা বললে ভাল হতো' এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ইবলিসী উক্তিও আমরা করে থাকি। ভাসা ভাসা জানতে পারলে বা বুঝতে পারলে অনেকে মনে করেন, সবই জানা হয়ে গেল। এমন যারা আছেন, তারা লাফালাফি খুব বেশি করেন। ওজনে যে বস্তু যত হালকা, বাতাসে সে তত বেশি হেলে দুলে। ভরা কলসি সহজে নড়ে না। অল্প পানির কলসি ছলাৎ ছলাৎ করে। পরচুলা সংক্রান্ত এই সহী হাদীস পাঠ করে আমার মনেও নানা জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছিল। এই জিজ্ঞাসা সৃষ্টির মূলে ছিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। তখন মনে হতো, আমিও তো কম বুঝি না। আল্লাহর কাছে অযুত শোকর আদায় করি, তিনি আমাকে এই ইবলিসি ওয়াসওয়াস থেকে রক্ষা করেছেন। কিভাবে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পেলাম, সে ঘটনা আমার কাছে পরমানন্দের। ১৯৮৩ সালের সম্ভবত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একদিনের কয়েকখানা দৈনিক সামনে নিয়ে একের পর এক প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। প্রথমে নজরে পড়লো, সিঙ্গেল কলামের ছোট এক খবরের শিরোনাম। শিরোনামটি ছিল এই, 'পরচুলায় সুখ নেই, শুধু অসুখ বাড়ে'। দ্বিতীয় দৈনিকে একই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় ভিন্ন শিরোনামে 'যুক্তরাষ্ট্রে পরচুলা নিষিদ্ধ'। আর এক দৈনিকের শিরোনাম ছিল 'সাবধান! পরচুলা ব্যবহার করবেন না'। অন্য এক দৈনিকের খবরের শিরোনাম ছিল, 'আর পরচুলা নয়'। সবগুলো খবর পাঠ করলাম। সব খবরই মোটামুটিভাবে এক, শুধু অনুবাদের কিছুটা হেরফের ছিল, কিন্তু মূল বিষয় ও মূল খবর ছিল অভিন্ন। এই খবর পাঠ করে বুঝলাম, আল্লাহর রাসূল ১৪শ' বছর আগে এক মহিলার মেয়েকে কেন পরচুলা ব্যবহারের অনুমতি

www.nagorikpathagar.org

দেননি। এর কারণ ও ব্যাখ্যা আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাই গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিলেন।

খবরটি ছিল এই, 'যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের ফেডারেল এজেন্সি পরচুলা বিক্রির ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করে টাকওয়ালাদের কৃত্রিম উপায়ে মাথায় নতুন চুল সুশোভিত করার দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা এবার চূড়ান্তভাবে শুধু পিছিয়েই যায়নি, এ সংক্রান্ত প্রচেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়। এজেন্সি বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। বিজ্ঞাপনের দাবি অনুসারে কৃত্রিম উপায়ে পরচুলায় মস্তক শোভিত করা যায় বটে, কিন্তু এতে প্রাকৃতিকভাবে পড়ে যাওয়া চুল কিংবা টাকের কোন উপকার হয় না। বাজারে যে হাজার হাজার পরচুলা পাওয়া যায়, তা ব্যবহার যেমন কষ্টকর, তেমনি ব্যয়বহুল এবং মানসিক শান্তিও ব্যবহারকারী পায় না, অধিকন্তু মারাত্মক ব্যাধি জন্ম নেয়। এজেন্সি জানিয়েছে, তারা তিনশ'-এর বেশি পরচুলা ব্যবহারকারী থেকে অভিযোগ পেয়েছেন। তাদের কারও মুখ ফুলে গিয়েছে, কেউ কেউ মাথা ব্যথায় ভুগছেন, কারও টাকে কাল্‌সিটে দাগ পড়েছে, কারও কারও মাথায় যে সামান্য চুলটুকু ছিল, তাও পড়ে শেষ হয়ে গেছে। কেউ কেউ মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। এজেন্সি পরচুলার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছে, পরচুলা ব্যবহার করে অনেককে জটিল চিকিৎসা, এমনকি শল্য চিকিৎসা পর্যন্ত করতে হয়েছে। ৭ জন রোগীর মাথায় অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম চুল ফেলে দিতে হয়েছে। ২১ জনের তাও করা যায়নি। তাদের মাথা কদর্যই রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসা বিজ্ঞানী তারা দীর্ঘ দিন এ নিয়ে গবেষণা করে এই ফলাফল পেয়েছেন।

যে চিরন্তন সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করতে ১৪শ' বছর সময় লাগলো, এমন বহু সত্য আল কোরআন ও আল-হাদীসে আছে যা এখনও বিজ্ঞানীদের কল্পনার বাইরে। তবে ধীরে ধীরে তারা চিন্তা-গবেষণা করে এসব সত্যের ধারে কাছে একদিন যাবেনই। তবে দুঃখজনক দিকটি হলো এই, সাধারণ মাথা দিয়ে না বুঝা এমন বহু সত্য আছে যা হুট করে বিজ্ঞানের আর আধুনিকতার অজুহাত তুলে, প্রগতির দোহাই দিয়ে অচল বা মধ্যযুগীয় বলে উড়িয়ে দেয়ার মানসিকতা যে কত অবৈজ্ঞানিক, এই পরচুলার দৃষ্টান্তের আয়নাই বিভ্রান্ত আক্কেলমন্দদের বিভ্রান্তি স্পষ্ট দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

কথায় বলে, এক গাছের বাকলা অন্য গাছে লাগে না। 'পর' কোন দিন আপন হয় না, যদি মনে মন না মিলে। অন্যের জামাও নিজের গায়ে লাগে না। দরজির কাছে মাপ দিয়ে জামা তৈরি করতে হয়। বাজার থেকে রেডিমেড জামা কিনলে অনুমানেও বুঝে নিতে হয় যে, এ জামা যার জন্য কেনা হচ্ছে তার গায়ে লাগবে কিনা। পরের চুল তো শিঁকড় কাটা চুল। সে চুল আমার মাথায় চেপে বসলেও আমি কখনো বলতে পারবো না যে, এ আমার চুল। ভাড়া করা নারী কখনো স্ত্রী'র আসন ও মর্যাদা কোনটাই পায় না। পরের চুল বা কৃত্রিম চুল মাথায় নিয়ে চেহারা-ছুরতে শোভা আনা সম্ভব হলেও মনে শান্তি পাওয়া যায় না। পরাশ্রয়ী, পরমুখাপেক্ষী, পরজীবী, পরচ্ছন্দী যারা আছে, তাদের জীবনেও পরচুলা ব্যবহারে সুখ নেই, শান্তি নেই, আছে জ্বালা আর পদে পদে বিড়ম্বনা। পরচুলা যারা ব্যবহার করেন, তারা নিজেদের জন্য করেন না, করেন পরের জন্য। নারীদের ব্যাপারটা তো কোন যুক্তিতেই গ্রহণ করা যায় না। যে সব নারী পরচুলা ব্যবহার করেন, তারা কখনো নিজেদের স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য এ কাজটি করেন না। করেন রাস্তাঘাটের হাট-বাজারের আর ক্লাব পার্টির পুরুষদের আকর্ষণের জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরচুলা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা যে কত বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক এবং ১৪শ' বছর অগ্রগামী, যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ ফেডারেল এজেন্সির একদল চিকিৎসা বিজ্ঞানী গবেষণাগারে বহু দিন গবেষণা করে প্রমাণ করে দিলেন। এর পরও কি কোনও যুক্তি থাকে?

www.nagorikpathagar.org

মডেলিং ও ফ্যাশন সংস্কৃতি

[বর্তমানের ফ্যাশন মানে নিছক খেয়াল আর শখের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু তাই নয়, এই ফ্যাশন বর্তমানে পর্ণোগ্রাফিতেও নেমে এসেছে। যেখানে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তন্বীদের ডাকা হয়। তারা মডেল হয়ে নানা ডিজাইনের পোশাক আর অলংকার পরিধান করে নিজেদের দেহকে নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দর্শকদের নজর কাড়ার চেষ্টা করেন। তাদের চোখে আর ঠোঁটে লেগে থাকে রোমান্টিক রহস্যময়তার হাসি।]

www.nagorikpathagar.org

বাণিজ্যের আবহে বাংলাদেশে মডেলিং ফ্যাশন প্রবেশ করেছে নানা সংকোচ ও সংশয়ের ঘোমটা টেনে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে টিভি পর্দায় মাত্র একটি বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে দেখা যায় শ্রাবণী চৌধুরীকে। দারুণ হিট। পিয়ারসন্স-এর বিজ্ঞাপনে তার মডেল স্টাইল অভিনয় বেশ সাড়া জাগায়। তারপর ম্যাজিক টাচ নেল পালিশের বিজ্ঞাপনে মডেল হয়ে চমক সৃষ্টি করেন রীমা নামের এক মেয়ে। এরপর পেপস জেল টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে মেহজাবিন। কেউ কেউ বলেন, এরাই টিভি বিজ্ঞাপনের মডেলিংয়ের পথিকৃৎ। তারপরে এ পথ ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে তন্বীরা আসতে থাকেন। ঝাঁকে ঝাঁকে আসার মওসুম শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে।

নব্বই দশকের শুরু থেকে এ দেশে মডেলিং বেশ রমরমা হয়ে উঠে। আকাশ সংস্কৃতির উন্মোচন ঘটার পর এ পেশায় প্রচণ্ড তেজ বাড়ে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশে যেন মডেলিংয়ের বাজার বসে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, বিভিন্ন ফ্যাশন শো এবং স্টেজ প্রোগ্রামের চাহিদা খুব বাড়তে তাকে মডেলদের। ঠিক এ সময় গজিয়ে উঠে রাজধানীতে মডেলিংয়ের অনেক এজেন্সি।

শুরুতে বলেছি, আমাদের দেশে বাণিজ্যের আবহে ফ্যাশন মডেলিং প্রবেশ করেছে। কিন্তু তারপর অপসংস্কৃতির মধ্যদিয়ে এর বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছে। এখন ফ্যাশন মডেলিংপন্থীদের কথা, মডেলিং আর ফ্যাশন বর্তমানে শুধু বাণিজ্যিক সংস্কৃতিই নয়, পুরোদস্তুর সংস্কৃতি। শিল্পের মর্যাদাও পেয়েছে, ইনস্টিটিউশন হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শুধুই তাই নয়, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, রেডিও-টেলিভিশনে, সিনেমায়, পাঁচতারা হোটেলে, বড় মাপের মেলায়, খেলায়, আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে মডেল ললনাদের দেখা যায় বিভিন্ন অ্যাকশনে ফ্যাশন সজ্জিত অলংকরণে। ফ্যাশন মডেলিং পণ্য প্রচারের বাহন হওয়া অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মাত্র একটি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাবলিসিটির জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপনী সংস্থা মডেল নির্ভর হয়ে পড়েছে অত্যধিক। কারণ, পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়িত্ব তারা দিয়েছেন মডেলদের। তারা তাদের পণ্যের প্রচারে মডেলদের ব্যবহারের সাফ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। কোন্ মডেল কোন্ পণ্য প্রচারে ব্যবহার হবে, তাও তারা বলে দেন।

নারী মডেলদের মূল পুঁজি কি কি? তাদের মূল পুঁজি হচ্ছে কুমারী বয়স, সুন্দর

www.nagorikpathagar.org

চেহারা (সুন্দর দাঁত, সুন্দর টানা টানা চোখ, সুন্দর হাসি, সুন্দর কেশ), নানা ভঙ্গিমায় বিভিন্ন তরঙ্গের হাসিতে কথা বলার আর্ট, গ্লামারস, পারফরম্যান্সের দক্ষতা, কেটওয়ার্কের নিপূণতা, স্মার্টনেস, দর্শক চিত্ত জয় করার আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি ইত্যাদি হল মডেল ললনাদের পুঁজি।

বেশ্যারা খোলা বাজারে নিজেদের দেহকে লম্পটদের ভোগে দিয়ে অর্থ রোজগার করে, কিন্তু নারী মডেলরা (যারা কুমারী) তা অবশ্য করে না বলে জানি (যদিও কারো কারো ক্ষেত্রে এমন অভিযোগও রয়েছে), তবে নারী মডেলরা নিজেদের রূপ-যৌবন, হাসি-চেহারা আর নানা ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে আর বর্ণালী বাহারী কথার মোহমায়ার জাল বিছিয়ে অর্থ রোজগার করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেহকে পুঁজি হিসেবে খাটায় বেশ্যারা এবং মডেলরাও। তবে ওরা (বেশ্যারা) ব্যবহার করে প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু এরা (মডেলরা) ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে। ফারাক আছে, ফাঁকি আছে, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন ক্ষেত্রে মিলও আছে, এ কথা কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন। উভয়ই দেহ আশ্রয়ী ব্যবসা। বয়স গেলে ব্যবসা আর থাকে না।

বাংলাদেশে ফ্যাশন মডেলিংয়ের পথিকৃৎ বলে আমি যাদের নাম আগে বলেছি, তাদেরই পথিকৃৎ হলেন বিবি রাসেল। তারই চিন্তাধারা ও আদর্শের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের বাদবাকি মডেলরা। সুতরাং বাংলাদেশে আজ আমরা মডেলিং ও ফ্যাশনের যে রমরমা বাজার দেখছি, এ বাজারের স্বাপ্নিক, রূপকার, স্রষ্টা ও জননী বলা যায় বিবি রাসেলকে। তারই প্রেরণায় বাংলাদেশের মেয়েরা ফ্যাশন মডেলিংয়ে নামে।

বিবি রাসেল সম্পর্কে তাই আমাদের কাছে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার। বিবি রাসেল বাংলাদেশের মেয়ে। ফ্যাশন মডেলিংয়ে আর ডিজাইনে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিবি রাসেলের আসল নাম মাসুমা রহমান। জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামে, পৈত্রিক বাড়ি রংপুরে। বড় হয়েছেন ঢাকায়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন বিলাতে। পিতার নাম মোখলেছুর রহমান (সিধু মিঞা)। রাজনীতিবিদ মরহুম মশিউর রহমান (যাদু মিঞা)-এর ছোট ভাই সিধু মিঞা। সেই সূত্রে সাবেক মন্ত্রী জাপা নেতা শফিকুল

www.nagorikpathagar.org

গণি স্বপন তার চাচাতো ভাই। সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের সাথেও তার রয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার ভাই-বোনদের প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এন্ড ক্লদিং (লন্ডন স্কুল অব ফ্যাশন) থেকে ডিজাইনের ওপর ডিপ্লোমা নিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে বিবি লন্ডনে চলে যান। এরপর ব্রিটিশ নাগরিক বব রাসেলের সাথে তার বিয়ে হয়। তার ঔরসে দুই ছেলে ওমর ও বিকি। তারপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বিবির পিতা মোখলেছুর রহমান (সিধু মিয়া) বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। বিবির বাপ-চাচাদের পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার এবং বাবা ও চাচা (যাদু মিয়া) দু'জনই বাম ধারার রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। বাপ-চাচার চিন্তাধারা ও জীবন ধারার প্রভাব বিবির উপর পড়ে। তার জীবনও সে ধাঁচে গড়ে উঠে। বিবি রাসেল চেইন স্মোকার, বেনসন ব্র্যান্ডের সিগারেট তার প্রিয় ব্র্যান্ড। বিবি ফ্যাশন টেক্সটাইল ও ডিজাইনের ওপর লেখাপড়া করার কারণেই হোক বা অন্য কোন লক্ষ্যে হোক, বিদেশকে তিনি তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিশেষ করে বিদেশই (ইতালি) তার কর্মক্ষেত্র। দেশেও আসেন ঘন ঘন। বিবি শৈশবে ও কৈশোরে নাচ-গান শিখেছেন। গওহর জামিল ছিলেন তার নাচের শিক্ষক। এই হলো মোটামুটিভাবে বিবি রাসেলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বিবি রাসেল এখন দেশে কোন মডেলিংই করেন না, সব করেন বিদেশে। বিবি রাসেলের তিন বোন। দুই ভাইয়ের একজন র‍্যাংসের মালিক।

বিবি রাসেল বলেছেন, 'আমার মেইন এইম হলো বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচানো, পজিটিভ বাংলাদেশ দেখানো।' তার আর একটা উক্তি, 'ফ্যাশন বহন করে সংস্কৃতির পরিচয়।'

আমার এ আলোচনা বিবি রাসেল-এর দু'টি উক্তিকে ভিত্তি করে। তার প্রথম উক্তিটির অর্থ বুঝলেও ভাবার্থ ও মর্মার্থ বুঝিনি। 'মোগল পাঠান হদ্দ হলো পার্সী পড়ে তাঁতী'-এ রকমের একটা কথা সমাজে চালু আছে। তিনি দারিদ্র্য মোচন করবেন। অনেকেই তো এ পথে হদ্দ হয়েছেন। সরকার, এনজিও এবং বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদসহ অনেকে। তিনি গ্রামীণ চেক নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁতীদের নিয়ে কাজ করছেন, বিবি প্রোডাকশন পরিচালনা করছেন আর বিদেশে মডেলিং করছেন, এসব দ্বারা বাংলাদেশের মহাদারিদ্র্যের মত রাক্ষুসকে বধ করতে পারবেন বলে কি মনে করেন? এ উক্তিও তার কোন 'কথার ফ্যাশন বা মডেলিং' কিনা তা তিনিই

www.nagorikpathagar.org

ভাল জানেন। সুতরাং তিনি এই রহস্যজনক উক্তি দ্বারা যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছেন, তা ভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তিনি বলতেন যে, ডিজাইনের ওপর আমি বিদেশে যে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, তা বাংলাদেশে আগ্রহী তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলব। তারা ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে দেশের পণ্য বিদেশে রফতানি করে দেশের জন্য সুনাম ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে; তাতে কিছুটা হলেও বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচনে আমার একটা ভূমিকা রাখাই 'মেইন এইম', যদি তিনি তা বলতেন, তাহলে মনে করতাম তার কথার মধ্যে বাস্তবতা কিছুটা আছে, তাতে কোন হেয়ালি নেই, ফ্যাশন বা অভিনয় নেই। যা হোক, তার কথা নিয়ে তিনি থাকুন, তার কথার কলি থেকে কি ফুল ফুটে, কি সৌরভ বের হয়, তা দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

তার দ্বিতীয় কথাটি 'সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে ফ্যাশন (এবং মডেলিং)'। স্বীকার করি, যার সংস্কৃতি যেমন তার ফ্যাশনও তেমন। যেমন বিবি যে সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন, তার চৈতন্য ও জীবনধারায় আর তার বাইরের ফ্যাশনে সেই সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হলো, বিবির সংস্কৃতি অর্থাৎ তিনি যেটাকে সংস্কৃতি মনে করেন, সে সংস্কৃতি কি আমার সংস্কৃতি? যদি তা আমার সংস্কৃতি না হয়, তাহলে সে ফ্যাশন যত অনিন্দ্যসুন্দর হোক না কেন, তা অপসংস্কৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আসুন, বিবির ফ্যাশন-মডেলিং নিয়ে আলোচনা করে দেখি তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশের তো ফ্যাশন আর মডেলিং সংস্কৃতি বিবির গর্ভজাত সন্তান। বিবি বলেছেন, সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে ফ্যাশন।

আমি মনে করি, শুধু ফ্যাশনই নয়, আমাদের চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, আহার-নিদ্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাসি-কান্না অর্থাৎ সব কিছুতেই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। যিনি যে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মানুষ, তার প্রতিটি কাজকর্মে সেই সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি যাত্রা শুরু করি বিস্‌মিল্লাহ বলে, নিতাই সামনে পা বাড়ায় হরিনাম বলে, জন পা বাড়ায় যীশু নাম নিয়ে, বড়ুয়া নেয় বৌদ্ধের নাম। এই বিভিন্নতা থাকবেই। এই বিভিন্নতা এ জন্য যে, সকলের সংস্কৃতি এক নয়। এক জাতি ও এক ধর্মের মানুষ হলেও সংস্কৃতি যে এক হবে, এমন কোন কথা নেই। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, নামে মুসলমান হয়েও সে যদি হয় নাস্তিক, সেক্যুলারিস্ট,

www.nagorikpathagar.org

বামঘেঁষা, জাহান্নামপন্থী, সুবিধাবাদী আদর্শপন্থী এবং পরকীয়া সংস্কৃতি প্রভাবিত, তাহলে তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ঐ ব্যক্তির সংস্কৃতি কিভাবে মিলবে, যে মুসলমান, যে কোন সংজ্ঞায় ও ব্যাখ্যায়? সুতরাং বিবি রাসেল যেটাকে বলেন সংস্কৃতি, আমি হয়তো বলি অপসংস্কৃতি; আবার আমি যাকে বলি সংস্কৃতি, হয়তো তিনি মনে করেন অপসংস্কৃতি। তাই এক জাত, এক দেশ, এক জাতীয়তা ও এক ধর্ম পরিচিতি থাকলেই কি সব এক হয়ে যায়? যায় না।

সংস্কৃতির দিকটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবার ফ্যাশন-মডেলিং সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। ফ্যাশন কি? ইংরেজি ফ্যাশন শব্দের উদ্ভব প্রাচীন ফরাসি ভাষার Fachon বা Facion শব্দ থেকে। Fachon বা Facion শব্দের উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ Factio বা Facio থেকে। এই দু'টি শব্দের অর্থ হল, কোন কিছুর ফর্ম তৈরি করা, নকল করা, বাহ্যিক দৃশ্য পরিবর্তন করা সময়ের দাবি অনুযায়ী। বিশেষ করে পোশাক ও অলংকারের সেপ বা প্যাটার্ন বদলানো। এর থেকে ইংরেজি ফ্যাশন শব্দের ব্যবহারিক অনুশীলন শুরু হয়।

মডেল শব্দও ফরাসি ভাষার Modele, Modelle বা Modello শব্দ থেকে উদ্ভূত। ল্যাটিন শব্দ Modus. 'A Pattern of something to be made, a form in miniature of something to be made on a large scale, a copy.' তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, মডেল মানে একটা নমুনা, যা আছে তার অনুকরণে নকল করে আকার দেয়া। আধুনিক ফ্যাশনে মডেলিং একেবারে যুক্ত, সোনার সাথে সোহাগা যেমন যুক্ত। মডেল না হয়ে ফ্যাশন করা যায় না কোন অনুষ্ঠানে। এক কথায় বলা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ বা অলংকার পরিধান করা বা তা বাজারজাত করার আগে ক্রেতাদের নজর কাড়ার জন্য দেহে ধারণ করে যে প্রদর্শনী করা হয়, এরই নাম ফ্যাশন বা মডেলিং।

বর্তমানের ফ্যাশন মানে নিছক খেয়াল আর শখের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু তাই নয়, এই ফ্যাশন বর্তমানে পর্ণোগ্রাফিতেও নেমে এসেছে। যেখানে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তন্বীদের ডাকা হয়। তারা মডেল হয়ে নানা ডিজাইনের পোশাক আর অলংকার পরিধান করে নিজেদের দেহকে নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দর্শকদের নজর কাড়ার চেষ্টা করেন। তাদের চোখে আর ঠোঁটে

www.nagorikpathagar.org

লেগে থাকে রোমান্টিক রহস্যময়তার হাসি। বিশেষ ভঙ্গিতে তারা হাঁটেন, দর্শকদের দিকে তাকান, দেহকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। ফলে এই ফ্যাশন সেক্স প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

এই ফ্যাশন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ কথা অবশ্য সঠিক; তবে যারা হাল আমলের পর্ণো-স্টাইল ফ্যাশনপন্থী, তাদেরই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, অন্য কারো নয়। এক কথায় বলা যায়, বিবি রাসেলদেরই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে ফ্যাশন। ড্রাগন, কুকুর, বিড়াল, সাপ, বিচ্ছু আর শিয়াল-শকুনের ছবির ছাপ মারা গেঞ্জিও তাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এ সব গেঞ্জি কারো কারো সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে সত্য, এ কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমি মুসলিম, আমার সংস্কৃতির পরিচয় তো বহন করে না। অধিকন্তু এটা পরিধান করে নামায পড়লে আমার নামাযই হবে না। তাহলে এই সংস্কৃতি আর ফ্যাশন-মডেলিংকে আমি কিভাবে আপন করে নিতে পারি?

মাথায় কাপড় না দেয়া, বগল কাটা ব্লাউজ পরিধান করা, কপালে লাল বা সবুজ টিপ দিয়ে, ঠোঁটে রঙ মেখে, পেট-পিঠ উদাম করে কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে ড্যামকেয়ার হয়ে চলার ফ্যাশনে তো আমার সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে না, এ ব্যাপারে বিবি রাসেলরা আমাকে যত মন্দ কথাই বলুন না কেন।

বিচিত্র ফ্যাশনের জঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে পড়েছে আমাদের সমাজ জীবন। নানা রুচি, নানা সংস্কৃতি, নানা ফ্যাশন, নানা মডেল সমাজে বিদ্যমান। এত রুচি, এত সংস্কৃতি, এত ফ্যাশন আর অসংখ্য মডেলের মধ্যে আমার বলতে যা দাবি করতে পারি, তা তো দেখি না, দুঃখ শুধু এই।

ফ্যাশন শুধু কাপড় পরিধানে বা নকশায় নয়, ফ্যাশন এসেছে বিভিন্ন যানবাহনে, গৃহের আসবাবপত্রে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, মূল্যবোধে, খেলাধুলায়, কেশ বিন্যাসে, প্রসাধনী ব্যবহারে এবং অনেক কিছুতে। একটা ফ্যাশনের স্থায়িত্ব হয়ত কয়েক মাস বা এক বছর, তারপর আসে অন্য ফ্যাশন। আগের ফ্যাশন হারিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লম্বা ট্রাউজার গোটা ইউরোপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা কিছুকাল পর হাঁটু পর্যন্ত এসে পড়ে। এ ফ্যাশন আমেরিকা ও ইউরোপে বহু দিন প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আবার লংপ্যান্ট ও খাট মোজার প্রচলন শুরু হয়েছে। ১৬শ' শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের আইন ছিল এই, ইংল্যান্ডে তৈরি উলের টুপি নিম্ন

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর মানুষকে অবশ্যই পরিধান করতে হবে এবং উচ্চ বর্ণের লোক ফরাসি এবং ইতালি থেকে আমদানিকৃত ভেলভেট হ্যাট পরিধান করবেন। এ রেওয়াজও চললো অনেক দিন। ১৯৬০-এর দিকে ব্লু জিন্স কাপড় পরিধান করে আমেরিকার একটি শ্রেণী নিজেদের রাজনৈতিক পরিচিতি জাহির করতেন। পরবর্তী সময়ে তা সাধারণের পোশাকে পরিণত হয়। এই ব্লু জিন্স কাপড় এখন ফ্যাশনে যোগ দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র তরুণ ও যুবকদের মধ্যে এই ব্লু জিন্স ফ্যাশন-দোরস্ত কাপড়।

১৬শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ত্রয়োদশ লুইস। তার মাথায় ছিল মস্তবড় টাক। এ জন্য তিনি ব্যবহার করতেন পরচুলা। তার এই পরচুলা ব্যবহার তৎকালীন ফ্রান্সের অনেকের কাছে একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়। ফরাসির অনেক লোক মাথা কামিয়ে পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরচুলা ব্যবহার অনেকের কাছে ফ্যাশনে পরিণত হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পোশাক-আশাককে অনেক ইংরেজ রমণীরা অনুকরণ করতে থাকেন এক ধরনের ফ্যাশন হিসেবে। এক সময়ে ঢাকা শহরে দেখা যায় অনেক তরুণের মাথা কামানো। অবশেষে জানা গেল, একটি ফিল্মে হলিউডি এক নায়ক অভিনয় করেন তার মাথা কামিয়ে, তারই অনুকরণে ওরাও মাথা কামিয়েছে। ২০০২ বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের চৌকষ খেলোয়াড় রোনাল্ডো মাথার চুল কামিয়ে সামনের দিকে কিছু চুল রেখে খেলেন। আর যায় কোথায়, বাংলাদেশের অনেক তরুণ রোনাল্ডোকে অনুসরণ করে সেই স্টাইলে মাথা কামিয়ে সামনে কিছু চুল রাখে। এই স্টাইলের নাম তারা দেয় রোনাল্ডো স্টাইল বা রোনাল্ডো ফ্যাশন। এভাবে ফ্যাশন মানসিকতা খেয়ালের পাগলা ঘোড়াকে বাহন করে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং আজও দৌড়াচ্ছে, হয়ত আগামী দিনগুলোতে আরো তেজে ও গতিতে দৌড়াতে থাকবে। আমাদের সমাজেও দেখা যায়, কেউ কেউ নতুন প্যান্ট কিনে দু'হাঁটুতে ভিন্ন রঙের কোন কাপড় লাগিয়ে তালিযুক্ত প্যান্ট পরিধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথবা কেউ কেউ দু'হাঁটুতে স্টিকার লাগিয়ে প্যান্ট পরছেন। অনেককে দেখা যায়, মেয়ে লোকের মত মাথায় লম্বা চুল রেখেছেন আর কেউবা খোপা করেছেন নিজ মাথার চুল দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়, এটা ফ্যাশন।

www.nagorikpathagar.org

তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, এসব খেয়ালী ফ্যাশনের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। এই ফ্যাশনওয়ালাদের কোন মূল্যবোধ নেই, যা মন চায় তাই তারা করেন, আর এটা হয়ে যায় তাদের ফ্যাশন। অস্থির ও পরিবর্তনশীল জীবন-লক্ষ্যের অনুসারীরাই নিত্য নতুন ফ্যাশনের অনুসন্ধানে দৌড়ায়। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, খেয়ালী ও বিলাসী মনগুলো ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফ্যাশনের অপর নাম বিলাসিতা হওয়ার কারণে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, ফ্যাশন শো বা মডেলিং, সুন্দরী তন্বীদের দেহ-ভঙ্গিমার প্রদর্শনের অপর নাম। তাই ফ্যাশন শো পর্ণো ভাইরাসে আক্রান্ত বলা যায়। আগেই বলেছি, ফ্যাশন শো কখনো মডেল ছাড়া হয় না, তাই ফ্যাশন শো আর মডেল মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র।

নর্তকীর ফ্যাশন, পতিতার ফ্যাশন, জিপসী বিলাসিনী উইমেনের ফ্যাশন আর পর্দানশীন মুসলিম মহিলার ফ্যাশন যেমন এক নয়; তেমনি সংস্কৃতিও এক নয়। আন্তর্জাতিক এক ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'Standards of beauty change through the years and people decorate themselves to fit their society's changing standers, ideas and beauty also vary from culture to culture.' অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড নেই, বিভিন্ন বছরে এ সবের পরিবর্তন হয়, সৌন্দর্যের ধারণাও সমাজে বদলায়, এর পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং বিবি রাসেলের ফ্যাশন সংস্কৃতি আর মডেল সংস্কৃতি বিবি রাসেলের, তার চিন্তাধারার অনুসারীদের জন্য। যে ফ্যাশন আমার সংস্কৃতি সমর্থন করে না, যে সংস্কৃতি আর ফ্যাশন আমার স্বকীয়তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তা আমার নয়, এটাই সাফ কথা, ফাইনাল কথা, তারপরে আর কোন কথা নেই। সুতরাং ফ্যাশন আর মডেলিং মুসলমানদের জন্য নয়, ইসলামের পরিভাষায় তা সাফ হারাম। এর গোটা কার্যক্রম হারাম। নতুনের উদ্ভাবন আর রুচির ও পছন্দের পরিবর্তন ইসলাম অস্বীকার করে না, কিন্তু তা যদি হয় ঈমানের এবং ঈমানভিত্তিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়, দেখতে যতোই চমৎকার দেখাক।

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি

[মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়ার কলাকৌশল একই। মূর্তি নামে যা গড়া হয়, তার মধ্যে মুখ্য থাকে ধর্মীয় মনোযোগ আর বিশ্বাস। কিন্তু ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোযোগ বা বিশ্বাস মুখ্য থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে যে বাদ যায়, তাও বলা যায় না। ভাস্কর্যে যখন ভাস্করের বা বিশেষ মহলের অথবা উদ্যোক্তাদের প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি খোদাই হয়ে দর্শকদের সামনে ভাসে আর তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তখন আর একে ভাস্কর্য বলা যায় না, সেটা মূর্তি হয়ে যায়। এমনকি যে ছবির ফ্রেমের উপরে তারকাটা বসিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবসে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়, সে ছবিটিও মূর্তির চরিত্র ধারণ করে। আমরা সাধারণত জানি, দেবদেবীর মূর্তি হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে এ ধারণাও প্রত্যাখ্যাত। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে, দেব-দেবীদের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, কেউ কি কখনো দেব-দেবীদের দেখেছেন? কেউ দেখেননি। কোন শিল্পীর নজরে তাদের ছায়াও পড়েনি। এখানে প্রশ্ন, তাহলে তাদের চেহারা একমাত্র কল্পনায় রূপ দেয়া ছাড়া কি সম্ভব? সুতরাং বলা যায়, কাল্পনিক হোক বা বাস্তব হোক, সবই মূর্তি। আর এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশেরই নতুন নামকরণ হয়েছে ভাস্কর্য। নর্তকীর নতুন নাম যেমন নৃত্যশিল্পী।]

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি ও ভাস্কর্যকে যে সব মুসলমান শিল্প-সংস্কৃতি বলে মনে করেন, তারা যদি এ সম্পর্কে দ্বীনী কোন ধারণাই না রাখেন, শরীয়ত এ সম্পর্কে কি কথা বলে, তাও না জানেন, আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগ সম্পর্কে বেখবর থাকেন, এমন কি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওসাল্লামের জীবনী পাঠ না করে থাকেন, না শুনে থাকেন, তাহলে তারা মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির রূপ দেখতে পারেন, নান্দনিকতা অবলোকন করে দু'নয়নকে তৃপ্ত করতে পারেন, এদিকে ঝুকতে পারেন, নিজেদের জড়াতে পারেন, এর চিন্তা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করতে পারেন, এমন কি এর উৎকর্ষ সাধনে ব্রতীও হতে পারেন।

এ অজ্ঞতা যে সব মুসলমানের নেই, তারা যেমন মূর্তি পূজারী হতে পারেন না, তেমনি পারেন না 'মূর্তি সংস্কৃতি'র প্রচার-প্রসারও উৎকর্ষতার জন্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও সহায়তা করতে। তবে মূর্তিকে ও মূর্তি পূজাকে যে সব অমুসলিম 'ধর্ম' বানিয়ে ফেলেছেন, তাদের এই ধর্মাচরণকে কোনভাবে বাধা দেয়া যাবে না, তাদের পূজার বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের ধর্মানুভূতিতে কোন আঘাত করা যাবে না, মন্দির, পুরোহিত আর পূজারীদের নিরাপত্তার জন্য সব রকমের সহায়তা করতে হবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। সূরা কাফেরুনই এ ব্যাপারে মুসলমানদের গাইড লাইন।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অজ্ঞতা, প্রগতি আর বিজ্ঞতার পর্দা ঝুলিয়ে নানা ব্যাখ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মূর্তি সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের অজ্ঞতা বাহানা মাত্র। নিরাকার আল্লাহর এবাদতের জন্য মাটি, কাঠ, পাথর প্রভৃতি দ্বারা কাল্পনিক আকার দেয়ার কোন স্থান বা কল্পনা ইসলামে নেই। এ ধারণার ব্যাখ্যা হয়তো সবিস্তারে প্রত্যেকের কাছে নেই, কিন্তু এতটুকু ধারণা প্রত্যেকের কাছেই আছে যে, ইসলামে মূর্তি পূজা নেই, মূর্তি তৈরিও নিষেধ, সাফ হারাম। মিলাদ মাহফিলে, ওয়াজ-নসিহতে, নানা আলোচনায় প্রত্যেকেরই এ ধারণা হয়ে গেছে যে, মূর্তি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা প্রগতি আর বিজ্ঞতার দোহাই দেয়, তাদের সঙ্গে বিতর্কে যেতে চাই না। ইবলিস তো আল্লাহর সঙ্গে বিতর্ক করতেও পিছপা হয়নি। আমরা আদমের সন্তান। আল্লাহর ফয়সালাই আমাদের জন্য চূড়ান্ত।

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি মনে করি। তাই তার জ্ঞানগর্ভ সেই আলোচনাটির সার-সংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করছি। তার বক্তব্য হচ্ছে এই "ইসলাম মূর্তি পূজার বিরোধী। মুসলমান মূর্তি পূজা করে না। মূর্তিকে তারা ঘৃণা করে। প্রতিমা, স্মৃতি চিহ্ন, স্মৃতিসৌধ, কোন মহাপুরুষের প্রতিকৃতি, যাবতীয় ছায়ামূর্তি স্থাপন করা, এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা ইসলামে শিরক ও মূর্তি পূজার সমান পাপ মনে করা হয়।

মূর্তি ও ভাস্কর্য সমার্থক। মূর্তি ও ভাস্কর্যের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে, 'আত তামাছিল'। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মা হাযিহিত্ তামাছিলুল্লাতি আনতুম লাহা আ'কিফুন।'

অর্থ : 'এই প্রতিকৃতিগুলো কি? যাদের তোমরা উপাসনা করছ?' এই আয়াতে মূর্তি বা তাদের উপাস্য দেবতাগুলোকে 'তামাছিল' বলা হয়েছে। অভিধানে মূর্তি, ভাস্কর্য ও ছবি এই তিনটির অর্থই 'তামাছিল' শব্দটি বহন করে। কোন ব্যক্তি বা জাতি যদি উপাস্য হিসাবে অথবা জাতীয় নিদর্শন হিসাবে কিংবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোন জীবজন্তু, গাছ-পাথর, চন্দ্র-সূর্য, দেব-দেবতা, নায়ক-নায়িকা, নেতা-নেত্রী প্রভৃতির ছবি বা আকৃতি মূর্তির ন্যায় নির্মাণ করে ও তা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করে কিংবা নিজ গৃহে লটকিয়ে রাখে, তাহলে তা শিরক হিসাবে গণ্য হবে।"

এককালে আরব জাতি মূর্তি পূজারীতে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। তারা লাত্, মানাত, হুবলসহ বহু দেব-দেবতার প্রতিকৃতি আরব ভূমির বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করেছিল এবং সেখানে সমবেত হয়ে এদের বেদীতে বিভিন্ন পর্ব বা উপলক্ষে 'অর্ঘ্য' ও পুষ্প নিবেদন করতো। মুশরিক আরব জাতির এদের প্রতি ছিল প্রচণ্ড রকমের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধানুভূতি। এই কাজটি তাদের বিশ্বাসের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটা পর্যায়ক্রমে তাদের জাতীয় জীবনে ও তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মক্কার মূর্তি পূজারীরা মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে মিনা বাজারের সন্নিকটে একটি বিশাল হুবল দেবতার মূর্তি স্থাপন করেছিল। কাবা গৃহের অভ্যন্তরেও বহু কল্পিত দেবতার প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কোরআন নাজিল শুরু হলে সূচনাতেই রাসূল (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে মুসলমান জাতিকে মূর্তি পূজার নাপাকি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। সূরা মুদ্দাসসিরের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ার রুযয়া ফাহজুর' অর্থাৎ 'হে রাসূল! আপনি মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকুন।'

বিখ্যাত তাফসিরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহুরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ মনীষীগণ এ স্থলে 'ওয়ার রুয্য়া'-এর অর্থ করেছেন প্রতিমা ও ভাস্কর্য।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) কোন মূর্তি ও ভাস্কর্য স্থাপন করেননি।

৮ম হিজরী সনে মুসলমানগণ সুদীর্ঘ ৮টি বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। ইতোপূর্বে মক্কার মুশরিকগণ মহানবী (সাঃ) এবং তার সাথী সাহাবীগণকে বহু কষ্ট ও নির্যাতন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে মুসলমানগণ রাতের আঁধারে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নেন। এতেই মুশরিকরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুহাজির এবং আনসারদের বিরুদ্ধেও একের পর এক ১০/১২টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। মুসলমানরা যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তাদের দুশমনদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং নিজেদের বিজয়ের আনন্দকে অম্লান করে রাখার জন্য বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন ও ভাস্কর্য নির্মাণ করাই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মহানবী (সাঃ) সে দিন মূর্তি পূজারী মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এবং বিজয়ের আনন্দে কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করেননি। বদর, ওহুদ, খন্দক, মুতাসহ বহু যুদ্ধে হাজার হাজার সহকর্মী-সাহাবীদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির পর যে ইসলাম আরবের বুকে কায়েম করেছিলেন, সেই রণপ্রান্তরগুলোতে তিনি একটিও ভাস্কর্য নির্মাণ করেননি, এমনকি বড় বড় সাহাবীদের কবরগুলোর পরিচয় পর্যন্ত নেই। পরবর্তীকালে রাসূলের চাচা বীরকেশরী আমীর হামযার কবরের পাশে পরিচয়ের জন্য নাম খচিত একটি স্তম্ভ খাড়া করে রাখা হয়েছিল মাত্র।

মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মূল করার জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। রাসূল

www.nagorikpathagar.org

(সাঃ)-এর নির্দেশে এবং নেতৃত্বে মক্কাসহ আরব ভূমি থেকে সকল মূর্তি ও জাহেলী যুগের স্মৃতিসৌধগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। বিজয়ী বেশে রাসূল (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন পর্যন্ত মুশরিকদের ধারণা ছিল, কাবাগৃহের মূর্তিগুলো তাদের রক্ষা করবে এবং সে জন্য কাবার মূর্তিগুলো ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণে অপেক্ষা করতে থাকে। মক্কায় প্রবেশের পর সর্ব প্রথম আল্লাহর নবী কাবাগৃহ থেকে মূর্তি অপসারণের কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি নিজ হাতে কয়েকটি মূর্তির গায়ে আঘাত করেন এবং বাকিগুলো হযরত আলী (রাঃ) ও অন্য কতিপয় সাহাবী ভেঙ্গে ফেলেন। এই সময় পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। 'বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।' তিনি এই আয়াত পাঠ করছিলেন এবং নিজ হাতের লাঠি দ্বারা মুশরিকদের নির্মিত মূর্তি ও ভাস্কর্যগুলোকে লক্ষ্য করে এদের বুকে আঘাত করছিলেন আর সাথে সাথে মূর্তিগুলো উল্টে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল।

শিরকের গন্ধযুক্ত নিদর্শন ধ্বংসে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পদক্ষেপ কম উল্লেখযোগ্য নয়। মুসলিম সমাজে যাতে শিরক কোন চোরা পথে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে শিরকের সন্দেহযুক্ত কোন কাজ হতে দেখলে তা সাথে সাথে বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে ২টি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য :

(ক) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করাকালে একটি বৃক্ষের নিচে হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এর কয়েক বছর পর দেখা গেল অনেক লোক এই গাছটিকে বুজুর্গ মনে করতে শুরু করে এবং এর নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করা পূণ্যের কাজ মনে করতে থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি গাছটিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সেখানে অবস্থান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এই গাছের মধ্যে শিরকের গন্ধ পেয়েছি।'

(খ) হযরত ওমর (রাঃ) একবার হজ পালন করতে মক্কায় যান। সেখানে কাবাগৃহের দেয়ালে রক্ষিত 'হাজরে আসওয়াদ' নামক পাথরটিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে কাল পাথর! আমি জানি, তুমি একটি পাথর ছাড়া কিছুই নও। যদি

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সাঃ) তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'

এ দু'টি ঘটনা থেকে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম শিরকের গন্ধযুক্ত কোন কাজকে শুধু বর্জনই করে না, একে সমূলে ধ্বংস করারও হুকুম দেয়।

পৃথিবীর কোন সেক্যুলার মুসলিম দেশের সরকার যদি মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ শিল্পে জড়িয়েও পড়েন, তাহলেও তা মুসলমানদের জন্য আদর্শ হতে পারে না।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের বুকে ঘুমিয়ে আছেন এমন অনেক পীর-আউলিয়া, আলেম-মাশায়েখ যারা মূর্তি পূজারী, অত্যাচারী পৌত্তলিক রাজাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশে তাওহীদের পতাকা উড়িয়েছেন। মুশরিকদের সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-এর পরিবর্তে এ দেশে তারা কায়েম করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও নিয়ম-নীতি। তারা চেয়েছিলেন শিরক বর্জিত জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে সমাজের সকল স্তরে উজ্জীবিত করতে। অথচ আজ আমরা দেখছি বিপরীত অবস্থা, বিপরীত দৃশ্য। তওহীদের চাষাবাদ করা এই ভূখণ্ডের রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মূর্তি প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী ইতিহাসও দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে এমন কোন উল্লেখযোগ্য হিন্দু ব্যক্তিত্ব নেই, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেননি। তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের জীবনপণ লড়াইয়ের ফসল হচ্ছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ নাজির আহমদ।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের লড়াইয়ের ফসল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন মূর্তি পরিবেষ্টিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এমন সব হিন্দু ব্যক্তিত্বের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, যারা সরাসরি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা এবং মুসলমান ও ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন, এখন মূর্তিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে রয়েছে তাদেরই অনেকের মূর্তি। কয়েকটি মূর্তির কথাই এখানে উল্লেখ করছি।

www.nagorikpathagar.org

স্বামী বিবেকানন্দ : তার বিশাল মূর্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আমৃত্যু তিনি এ দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী তৎপরতার সাথে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি পরিচিত। এ দেশের মানুষ ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার কি সম্পর্ক? কেন তিনি এই ক্যাম্পাসে দন্ডায়মান?

জগন্নাথ হলের ভিতরে, মধুর ক্যান্টিনের সামনে, শামসুন্নাহার হলের সামনে জয়দ্বীপ দত্ত চৌধুরী, মধুসূদন দে ও মনিরুজ্জামানের তিনটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনোয়ার পাশা ভবনের সামনে রয়েছে হিন্দু অবতার কৃষ্ণ ও তার প্রেমসঙ্গিনী রাধার যুগল মূর্তি।

গাছের তলে ঝোঁপের আড়ালে মূর্তি। ভাস্কর্যের নামে শিল্প সৌকর্যবিহীন অগণিত মূর্তি এলোমেলোভাবেও ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। যুবক-যুবতীর মূর্তিও রয়েছে। টিএসসি সড়ক দ্বীপেও মূর্তি।

শতাধিক মূর্তি পরিবেষ্টিত এবং সরাসরি ১৭টি মূর্তির মাথার উপর তর্জনী উঁচিয়ে ৬০ ফুট উঁচু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মূর্তিটি এ এলাকায় ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। 'অপরাজেয় বাংলা' স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থাপিত হয়।

ডাসের পিছনে 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' মূর্তি। যৌন আবেদনময় রুচিহীন অনেক মূর্তি যত্রতত্র পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে মূর্তিময় করার পিছনে যার অবদান সর্বাধিক, সেই শামীম সিকদার নিজেরও দু'টি মূর্তি নির্মাণ করে বসিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

মূর্তি, মূর্তি এবং মূর্তি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রীতিলতা, সূর্যসেনসহ বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং মুসলিম অস্তিত্ব বিদ্বেষী কেউ বাদ যাননি এই মূর্তির বহর থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে এখন মূর্তির ছড়াছড়ি।

www.nagorikpathagar.org

চারুকলার স্থপতি জয়নুল আবেদীনকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু মূর্তি আর মূর্তি। ঐতিহাসিক জাহেলিয়াতের যুগের ৩৬০টি মূর্তির রেকর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অনেক আগেই ভঙ্গ করেছে। এখন মূর্তি সংস্কৃতিপন্থীদের লক্ষ্য দেশের প্রত্যেক শহর, নগর, বন্দর এমনকি থানা সদর পর্যন্ত মূর্তি দিয়ে ভরে তোলা। কোন কোনটা হবে চেনাজানাদের মূর্তি (ভাস্কর্য নামে) আর কোন কোনটা হবে অচেনা ও অজানাদের মূর্তি। ভাস্কর্য নামে আন্দোলন করে মূর্তির প্রতিষ্ঠা, কি চমৎকার কৌশল!

দৈনিক ইনকিলাবের মেহেদী হাসান পলাশের একটি তথ্যবহুল রিপোর্ট 'মূর্তিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে ৩রা জুলাইতে (২০০০ সালে) প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি সাজানো হয় মুজাহিদুল ইসলামের তোলা অনেক ছবি দিয়ে। এখানে জনাব মেহেদী হাসানের রিপোর্টেরই কিছু অংশ তুলে ধরছি।

মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ মূর্তিময় হয়ে উঠেছে। শিল্পের নামে শত শত মূর্তি ও মূর‍্যাল চিত্র তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ পৌত্তলিক সংস্কৃতি চর্চার আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। অথচ পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবির স্বীকৃতি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন কলিকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজপতি, জমিদারবর্গ ও উচ্চশিক্ষিত জন। এমনকি পূর্ব বাংলারও বহু উচ্চশিক্ষিত হিন্দু নেতৃবৃন্দ একই সুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে উক্ত সম্প্রদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিতে তৎপর হন। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ তৎপরতা অব্যাহত আছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসও পরিচালনায় মুসলমানদের পিছে ফেলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন সুবিধার বিনিময়ে এই বর্ণবাদী অপশক্তি এরই মধ্যে মুসলমানদের মাঝেও একটি সুবিধাভোগী চক্র সৃষ্টি করে ফেলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন হওয়ার পর এর প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মূর্তিময় করার প্রক্রিয়া। ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সময়ের ডাকসু নির্বাচিত (মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম-মাহবুব জামান) নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদকে অনুরোধ করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আর্ট কলেজের প্রথম রজতজয়ন্তী উৎসবে ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এটি। পরবর্তীতে ডাকসুর প্রস্তাবে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর এর কাজ থেমে যায় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। তখন এ ভাস্কর্যের নাম দেয়া হয় 'অপরাজেয় বাংলা'। এরপর ১৯৮৭ সালের ১০ তারিখে নূর হোসেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য কলার অধ্যাপক শামীম শিকদার সহকারী শিল্পী হিমাংশু রায় ও আনোয়ার চৌধুরীকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল টিএসসির সামনে একটি নতুন ভাস্কর্য স্থাপন করেন। শামীম সিকদার এর নাম দেন 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা'। এটিও মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর। এই ভাস্কর্যের মূল বেদীর উপরে ৬টি মূর্তি এবং বেদীর গায়ে প্রায় ৫০টি মূর্তি খোদিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাস্কর্য আছে ভাস্কর্য তৈরি কারখানা চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। চারুকলা ক্যাম্পাসের আনাচে-কানাচে ৭৫টির মত মূর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এছাড়াও ক্লাস রুমে শতাধিক নির্মিত এবং নির্মিতব্য মূর্তি চোখে পড়ে। চারুকলার বকুলতলার সামনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিরাট মূর্তি (রং-তুলি হাতে) চোখে পড়ে। পূর্বে জয়নুল গ্যালারির আশপাশে আরও মূর্তি ছড়ানো ছিটানো ছিল। কিন্তু এগুলোর ভাস্কর শামীম শিকদার অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত মধু তথা মধুসূদনদের একটি মূর্তি মধুর কেন্টিনের সামনে স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বেকার মূর্তিটি ভেঙে ফেলার পর এটি স্থাপন করা হয়েছে। জগন্নাথ হলের পুকুরপাড়ে স্থাপিত হয়েছে শহীদ(?) জয়দ্বীপ চৌধুরী বাপ্পীর মূর্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাড়ির সামনেও একটি বড় ভাস্কর্য চোখে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের নাম মূল স্তম্ভগুলোর এক পাশে মার্বেল পাথরে খোদাই করা হয়েছে। অন্য পাশে পোড়া মাটির ফলকে বহু মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি। এই ভাস্কর্যের নামফলকটি হয়তো কোন সোনার ছেলেদের(?) হাতে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। মহসীন হলের গেটে বসুনিয়া তোরণের পাশে ছাত্রনেতা রউফুন বসুনিয়ার একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। জহুরুল হক হলের গেটের ভেতরে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রলীগ নেতা চুন্নুর নামফলক স্থাপন করা হয়েছে। এখানে চুন্নুর মূর্তি তৈরির আলাপ-আলোচনা চলছে বলে জহুরুল হক হলের এক আবাসিক ছাত্র জানান। শামসুন্নাহার হলের সামনের সড়ক দ্বীপে স্বাধীনতা-উত্তরকালের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি 'উৎসর্গীকৃত' একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর আলাউদ্দিন বুলবুলের এই ভাস্কর্যের নাম 'জয় বাংলা-জয় তারুণ্য।' শামসুন্নাহার হল ও জগন্নাথ হলের স্টাফ কোয়ার্টারের মধ্যস্থিত সড়কের পাশে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। টিএসসির সামনে '৯০-এর গণআন্দোলনে নিহত ডাঃ মিলনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। 'নিঝুম স্থাপত্য আজ প্রতিবাদী মিলনের মুখ' শিরোনামে এই ভাস্কর্যকে ঘিরে এই এলাকাটি মিশন চত্বর নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কোয়ার্টার আনোয়ার পাশা ভবন (পুরাতন জাদুঘর) প্রাঙ্গণে বর্তমানে প্রায় ৩০টি মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে বংশীবাদরত অবস্থায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তিও চোখে পড়ে। এই এলাকায় পূর্বে আরও অনেক মূর্তি ছিল। কিন্তু সেগুলো সরিয়ে নিয়েছেন শামীম সিকদার। জগন্নাথ হলের মাঠে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিরাট মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এটিরও ভাস্কর শামীম সিকদার। এর পাশেই জলকেলিরত দু'টি বৃহৎ রাজহংসের মূর্তি আছে। ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৫ সালে হলের ছাদ ধসে নিহত ছাত্রদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বর্তমান অক্টোবর ভবন হলের মাঝে একটি ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে।

জগন্নাথ হল, এসএম হল এবং উদয়ন স্কুলের মোহনায় ফুলার রোডে শামীম সিকদার বিরাট এলাকা জুড়ে বহু মূর্তির সমন্বয়ে একটি নতুন ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। শামীম সিকদার এখানে চারুকলা ও আনোয়ার পাশা ভবনের আশপাশে

www.nagorikpathagar.org

ছড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলো এনে বসিয়েছেন এখানে। প্রায় ৮০টির মত মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসানো হয়েছে। কাজ নিখুঁত না হওয়ায় এদের সনাক্ত করা কষ্টকর। যে ক'জনকে শনাক্ত করা যায়, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, সূর্যসেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাজা রামমোহন রায়, সুভাস বসু, লালন ফকির, নূর হোসেন অন্যতম। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তিও এখানে আছে বলে জানা গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম শীর্ষক এই ভাস্কর্যের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চ। মূল বেদীতে ১৮টি মূর্তির সমন্বয়ে '৫২ থেকে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই ১৭টি মূর্তির উপরে শেখ মুজিবের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এর উচ্চতা ৬০ ফুট, পরিসীমা ৮৫-৭৫ ফুট, বাতি ৪২টি, সংকেতবাতি ১টি, লাইটিং স্টার ১টি, পানির পাশা ১টি, ফোয়ারা ৬টি। ভাস্কর্যের আলোক সম্পাত এবং শব্দ প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা রয়েছে। ভাস্কর্যের প্রবেশ এবং বাহির পথে শামীম সিকদারের নিজের ২টি মূর্তি আছে। এক পাশে নির্মিত পুলিশ বক্সে ২ জন করে পুলিশ ২৪ ঘণ্টা পাহারারত থাকে। এই ভাস্কর্য সম্পর্কে এসএম হলের আইন বিভাগের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শামীম সিকদারের ভয়ে) এক ছাত্র বলেন, পুরো বিষয়টি আমার কাছে গোলমেলে মনে হয়। '৫২ থেকে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়কে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে শামীম সিকদার কি জাতিকে এই বোঝাতে চান যে, স্বাধীনতার সংগ্রাম '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেষ হয়েছে? টিএসসির সড়ক মোহনায় বর্তমানে আরও একটি ভাস্কর্য নির্মাণাধীন। ৮টি মূর্তির সমন্বয়ে সন্ত্রাস বিরোধী এই ভাস্কর্যের নামকরণ করা হয়েছে 'রাজু ভাস্কর্য।' ভাস্কর শ্যামল (পুরো নাম জানা যায়নি)। এছাড়া কার্জন হলের সামনে দোয়েল চত্বরেও ২টি দোয়েলের মূর্তি চোখে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শনকালে এই শত শত মূর্তি ছাড়াও বেশ কিছু মুরাল চিত্র চোখে পড়ে। বাংলা একাডেমীর দেয়ালে ১৯৯৮ সালে এক বিশাল দেয়াল চিত্র নির্মিত হয়েছে। '৫২ থেকে '৭১ শিরোনামে বিশাল এই দেয়াল চিত্রে শেখ মুজিবের বিরাট ছবি সকল পথচারীর চোখে পড়ে। এছাড়াও এর মুরাল চিত্রে প্রায় দুইশ' মানুষের মূর্তি পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর

www.nagorikpathagar.org

রহমান হল, শেখ মুজিব হল এবং স্যার এএফ রহমান হলের প্রবেশ পথে তাদের নিজেদের বিশাল মুরাল চিত্রও খোদিত হয়েছে।

মাওলানা আকরাম খাঁনের মূর্তি রয়েছে চারু ও কারুকলা কলেজে। এই মূর্তি নির্মাণ করেছেন শামীম সিকদার।

বাংলাদেশে মূর্তি তৈরির প্রথম ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ৮ই এপ্রিল। ১৯৬৪ সালে মাত্র দু'জন ছাত্র নিয়ে তৎকালীন আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এ বিভাগে ছাত্রের অভাব নেই। প্রচুর ছাত্র। মূর্তি-ভাস্কর্যের ছড়াছড়িই প্রমাণ করে বিভাগটি কত সরগরম।

১৯৮৩ সালের মে মাসে জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার একটি থানার মালখানা থেকে ৬টি মূর্তি এনে এলিফ্যান্ট রোডে পুলিশ অফিসার্স মেসে স্থাপন করেন। অফিসার্স মেসের 'শোভা বর্ধনের' জন্যই স্থাপন করা হয় বলে কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। মসজিদ নগরী ঢাকাকে মূর্তি নগরীতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন চলছে।

মূর্তি পূজা, মূর্তি নির্মাণ, মূর্তির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন ইসলামে সাফ হারাম। মুসলিম নামের মূর্তিপন্থীরা বলছেন, আমরা তো মূর্তি তৈরি করছি না, ভাস্কর্য তৈরি করছি। ভাস্কর্য দিয়ে রাজধানী সাজাচ্ছি। এটা তো দোষের নয়। মুসলিম নামের একজন ভাস্কর বলেছেন, মূর্তি আর ভাস্কর্য এক বস্তু নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ সব ফতোয়া আর কনসেপশন তারা কোথায় পেলেন, তা তারাই ভাল জানেন। পাজামার দু'পা পৃথক, কিন্তু কোমরের দিকে এসে উভয় পা এক হয়ে গেছে। এক পায়ের পাজামা হয় না। দু'পায়ের পাজামা হয় আর দু'পা আর অভিন্ন কোমর নিয়েই পাজামা বা ফুল প্যান্ট। পৃথক করার কোন ব্যবস্থা নেই। মূর্তি আর ভাস্কর্য সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। বেশ্যা আর যৌন কর্মীর মধ্যে যেমন শব্দের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই, তেমনি মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যেও শব্দের পার্থক্য ছাড়া বিশেষ আর কোন পার্থক্য নেই। অতি হালকা একটা পার্থক্য আছে তা পরে আলোচিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি মানে দেহ, শরীর, আকৃতি, চেহারা, রূপ, প্রতিমা অর্থাৎ মূর্তিমান, মূর্তিপূজা, অশরীরীর দেহ ধারন, বাস্তব বা কাল্পনিক দেহ গড়ন ইত্যাদি। মূর্তিকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় **Idol**। এই আইডল সম্পর্কে সংস্কৃতি স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য পুস্তকে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে মাত্র তিনটি উদ্ধৃত করলাম।

1. An image of God or Goddess.

2. An object of worship

3. An object of love of deep devotion or admiration.

তরজমা :

১. দেবদেবীর প্রতিমূর্তি

২. পূজার বস্তু

৩. ভালবাসা বা পরমভক্তির পাত্র বা বস্তু।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রামাণ্য পুস্তকে মূর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, শুধু দেবদেবীর প্রতিমা তৈরির নামই মূর্তি নয় বরং Any person or thing on which we strongly set our affection; that to which we are excessively, often improperly attached. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা এমন গভীর থাকে, যার ফলে আমরা তাতে সীমা লংঘন করে এবং কখনো অযৌক্তিকভাবে যুক্ত হয়ে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর আকৃতি গড়ে তুলি, তাও মূর্তি।

Dr. Annandale's concise Dectionary, Page 343.

ভাস্কর্যকে ইংরেজি ভাষায় বলে, Sculpture. এর মানে ও ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, The Art of carving, cutting or hewing stone or other materials into images of men, beasts. The Art of imitating natural objects in solid Substances representating some real or imaginary objects.

www.nagorikpathagar.org

মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়ার কলাকৌশল প্রায় একই। মূর্তি নামে যা গড়া হয়, তার মধ্যে মুখ্য থাকে ধর্মীয় মনোযোগ আর বিশ্বাস। কিন্তু ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোযোগ বা বিশ্বাস মুখ্য থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে যে বাদ যায়, তাও বলা যায় না। ভাস্কর্যে যখন ভাস্করের বা বিশেষ মহলের অথবা উদ্যোক্তাদের প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি খোদাই হয়ে দর্শকদের সামনে ভাসে আর তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তখন আর একে ভাস্কর্য বলা যাবে না, সেটা মূর্তি হয়ে যায় এমনকি যে ছবির ফ্রেমের উপরে তারকাটা বসিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবসে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়, সে ছবিটিও মূর্তির চরিত্র ধারণ করে।

আমরা সাধারণত জানি, দেবদেবীর মূর্তি হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে এ ধারণাও প্রত্যাখ্যাত। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে, দেব-দেবীদের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, কেউ কি কখনো দেব-দেবীদের দেখেছেন? কেউ দেখেননি। কোন শিল্পীর নজরে তাদের ছায়াও পড়েনি। এখানে প্রশ্ন, তাহলে তাদের চেহারা একমাত্র কল্পনার রূপ দেয়া ছাড়া কি সম্ভব? সুতরাং বলা যায়, কাল্পনিক হোক বা বাস্তব হোক, সবই মূর্তি। আর এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশেরই নতুন নামকরণ হয়েছে ভাস্কর্য। মূর্তকীর নতুন নাম যেমন নৃত্যশিল্পী।

মুসলমানদের জন্য ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ মূর্তিময় হয়ে উঠেছে। মূর্তি স্থাপনের এরিয়া ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এক সময় ঢাকাকে বলা হতো মসজিদের নগরী। তারপর লোকে রিকশার নগরীও বলতো, এখনো বলে। বস্তির নগরীও বলে থাকে। দু'দিন পর মূর্তির নগরীও বলবে, সে সময় দ্রুত আসছে। তখন হয়তো মসজিদ আর মূর্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগবে। তখন যদি মূর্তিপ্রেমিকরা মসজিদের উচ্ছেদ চায়, তাহলে অবাক হওয়ার কোন কারণ থাকবে না। মূর্তির দেশে মসজিদের সংখ্যা এসব কারণেই কমে।

কালে কালে তো আমরা অনেক পরিবর্তনই দেখছি। নর্তকীকে দেখছি নৃত্য

www.nagorikpathagar.org

শিল্পী রূপে। বেশ্যাদের নাম হয়েছে যৌন কর্মী, রাহাজানি করে যে সব দস্যু, তারা হয়েছে ছিনতাইকারী। ভারতীয় মূর্তি সভ্যতা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ভাস্কর্য নামে। কারণ, মূর্তির মর্মবাণী আর দর্শন বাংলাদেশীদের শোনাতে গেলে বা সে শিক্ষা বাংলাদেশীদের অন্তরে স্থাপন করতে হলে ভাস্কর্যের মুখোশ তো অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশে মূর্তি ও ভাস্কর্য সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে। যা মূর্তি তাই ভাস্কর্য। পূজার মূর্তি কল্পিত, ভাস্কর্যরূপ মূর্তি পরিচিত, মাঝে মাঝে কিছু আছে বিমূর্ত। ফারাক শুধু এই। আজকাল মিছিলেও মুখোশ মূর্তি লাগান হয়।

এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তৌহিদবাদীদের কাছে ব্যক্তি বা বস্তু পূজার কোন কানাকড়ি মূল্য নেই। এই পূজার ধারণা প্রত্যেক মু'মিনের মগজ থেকে, মন থেকে বিলকুল মাইনাস। এখন যদি এই মাইনাসকে মাইনাস করা সম্ভব হয়, আর সে স্থানে স্থাপন বা প্রতিস্থাপন করা যায় মূর্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও ভালবাসাকে, তাহলে এই মগজে বহু খোদার রাজত্ব কায়েম হবে, শয়তান হবে সে রাজত্বের গভর্নর। বিনা হামলায় কৌশলে কাবু। এ জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গন সুকৌশলে দখলের চিন্তা করে কুশলী শিকারীরা। কখনো নীরবে আবার কখনো সরবে এবং সাড়ম্বরে শিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এক সময় আরব দেশে মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূর্তির ব্যাপারে তারা অন্ধ ছিল। মূর্তি আর মদ ছাড়া তারা কিছু বুঝতো না। এমন কি কাবা গৃহে এবং কাবা আঙ্গিনায় ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। কিন্তু আমরা হয়তো জানি না যে, ইতিহাসের যে পর্যায় থেকে আরব দেশে মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু হয়, তার আগে গোটা আরব দেশের কোথাও মূর্তি পূজা ছিল না, সে কথাও ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

মূর্তির ব্যাপার-স্যাপার বিশ্বের নেতৃস্থানীয় কোন ধর্মে নেই এবং কখনো ছিল না। মূর্তির পূজা একান্তভাবে কাল্পনিক এবং এ আইডিয়া অবৈজ্ঞানিকও। ধর্মের সঙ্গে মূর্তির কোন সম্পর্কও নেই। মূর্তিপূজা বিশ্বের একটি মাত্র ধর্মের মূলধারায় এবং তার শাখা-প্রশাখায় রয়েছে, অন্য কোন ধর্মে মূর্তি পূজা নেই। আরবে এক সময় মূর্তিপূজা ছিল না, আবার এক সময় ছিল, তারপর মূর্তি পূজা ও মূর্তি চিরতরে নির্বাসিত হয়। মূর্তি পূজার স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। দলিল থাকবেই বা কেমন

www.nagorikpathagar.org

করে। দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে যারা মূর্তিকে সামনে নিয়ে পূজা করে, তারা কি বলতে পারে যে এই মূর্তির চেহারা অমুক দেব বা দেবীর? দেব-দেবীর অস্তিত্ব আছে বলে যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে মেনে নিলেও এ প্রশ্ন কি করা যায় না যে, দেব-দেবীরা কি দৃশ্যমান? মানুষ কি তাদের দেখতে পায়? না, দেখা যায় না, মানুষ দেখতে পায় না, তারা দৃশ্যমান নয়, তারা কায়াহীন, অদৃশ্য। যাদের দেখা যায় না, অদৃশ্য তাদের প্রকৃত চেহারা, মাটি, পাথর বা কাঠের মূর্তিতে রূপ দেয়া কি সম্ভব? মোটেই সম্ভব নয়, শুধু কল্পনা করা যায়। সুতরাং ধর্মীয় কোন ভিত্তি ছাড়া শুধু কল্পনায় গড়া মূর্তি আর মূর্তি সামনে নিয়ে পূজা কখনো ধর্মীয় পূজা হতে পারে না, সংস্কৃতিও নয়। সংস্কৃতি তো সংস্কার থেকে উদ্ভূত। যে সংস্কারে ধর্মীয় ভিত্তি নেই তা সংস্কার হয় কেমন করে, সংস্কারের তো একটা ভিত্তি থাকতে হবে? ভিত্তিটা কি? তার সংস্কার ছাড়া সংস্কৃতি হয় না। ধর্মে যে প্রথার স্বীকৃতি নেই সে প্রথাকে পূজায় আনা যায় না।

সনার্তন পূজা মূর্তি পূজা নয়। জাজিরাতুল আরবের কথাই ধরা যাক। ইসলামের আগমনের অনেক আগে আরবে মূর্তি ছিল না, মূর্তিপূজাও ছিল না। আরব দেশে সর্ব প্রথম প্রতিমা পূজার ভিত্তি স্থাপন করে আমর ইবনে লুথাই নামক এক ব্যক্তি। তার আসল নাম ছিল রাবেয়া ইবনে হারেসা। আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র 'বনী খোজায়া'র অধঃস্তন বংশধর এই হারেসা। আমরের পূর্বে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি কাবা গৃহের পরিচালক ছিল। জুরহুমকে আমর এক যুদ্ধে পরাজিত করে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে নিজেই কাবা গৃহের পরিচালক হয়। এই আমর একবার সিরিয়ার কোন এক শহরে গিয়ে দেখে সে শহরের লোকজন প্রতিমা পূজা করছে। সে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কেন ওদের পূজা করো? উত্তরে তারা বললো, এরাই তো আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। যুদ্ধে এরাই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে। যুদ্ধে এরাই আমাদের বিজয় দান করে থাকে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এরাই বৃষ্টিবর্ষণ করে।

এসব কথা শোনার পর আমর তাদের থেকে কয়েকটি প্রতিমা কিনে নিয়ে মক্কায় আসে। কাবাগৃহের আশপাশে এগুলো স্থাপন করে। কাবাগৃহ ছিল সমগ্র

www.nagorikpathagar.org

আরব দেশের কেন্দ্রস্থল, তাই সমস্ত আরব গোত্রে প্রতিমা প্রচলন হয়ে গেল সে সময় থেকে [সিরাতুন্নবী (সাঃ) : আল্লামা শিবলী নোমানী পৃষ্ঠা ১৭-]।

হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তা রাজ্যে দু'টি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে বৈদিক অপরটি তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার মূল ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও উপনিষদ, আর তান্ত্রিক ধারা হচ্ছে অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ। দেব-দেবীর পূজা কিংবা মূর্তিপূজা তান্ত্রিক মতানুসারে সম্পন্ন হয়। বৈদিক যুগে মূর্তি পূজা ছিল না। সেই যুগে আরাধনার মাধ্যম ছিল যজ্ঞকর্ম। ঈশ্বরকে সকার রূপে আরাধনা করা, অসীমকে সীমার মাঝে, অপরূপকে রূপ দিয়ে মূর্তি পূজার বা পূজা পদ্ধতির আবিষ্কার বৈদিক পরবর্তী যুগে হিন্দু মুণি-ঋষির দ্বারা প্রবর্তিত হয়। ষোল শতকে বাংলাদেশে রাজশাহীর এক পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শে রাজা কংস নারায়ণ প্রতিমা গড়ে দুর্গা পূজা শুরু করেন। হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বর আরাধনা ওদের দেবীর বন্দনা হাজার হাজার বছর ধরে যদিও প্রচলন ছিল, কিন্তু মূর্তি গড়ে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর বন্দনা ছিল না (প্রেম রঞ্জন দেব)।

এস মুজিবুল্লাহ মরহুমের একটি নিবন্ধ 'দুর্গা পূজার ইতিহাস' শিরোনামে সাপ্তাহিক রোববার-এ তার ইন্তেকালের পর প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'শারদীয় দুর্গা পূজার চল হয় পলাশীর যুদ্ধের পর। প্রথম দুর্গাপূজা হয় ১৭৫৭ সালে নদীয়ায় এবং শোভা বাজারের রাজবাড়ীতে। মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্র এ পূজার প্রথম আয়োজন করেছিলেন। শারদীয় দুর্গাপূজার প্রবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি মানসিক ব্যাপার। পলাশীর যুদ্ধের সময় ধনী বাঙালি হিন্দুরা ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে। তারা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মুসলমান শাসনের অবসান। কাজেই ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর জয়কে মনে করেছিলেন নিজেদের জয় বলে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সে বছর বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন দুর্গাপূজার মাধ্যমে। প্রথম দিকে দূর্গাপূজা ছিল পলাশীর যুদ্ধের 'বিজয়োৎসব'। পরে তা পর্যবসিত হয়েছিল 'পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি উৎসব' হিসাবে, কিন্তু প্রথার বিশেষ হেরফের হয়নি। পান-ভোজন, বাইজি নাচ, সাহেব বরণ- সবই চলে আসছিল। দুর্গাপূজার কথা বলতে গেলে যেমন বাইজি নাচের কথা আসে,

www.nagorikpathagar.org

তেমনি সাহেব বরণের কথাও এসে যায়। সাহেবদের তুষ্টি সাধনের জন্যই দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাইজি নাচের আয়োজন হতো। সাহেবরা ছিল বাবুদের কাছে দেবতা বিশেষ। ক্লাইভ ছিলেন স্বয়ং মা দুর্গার প্রতীক। ধনী হিন্দুদের বাড়িতে সাহেব পূজা বা সাহেব বরণেরও চল হয়েছিল (মাসিক নবকল্লোল)।

প্রেম রঞ্জন এবং এস মুজিবুল্লাহর তথ্যের মধ্যে কালের ব্যবধান থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, ষোল শতকের আগে দুর্গার কোন মূর্তি ছিল না এবং দুর্গাপূজাও ছিল না।

মূর্তি গড়ার ইতিহাস যখন এই, তখন মূর্তিকে মুসলমান নামের বাবু-মুসলমানরা কোন্ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এত ভালবাসতে শুরু করলেন, তা বুঝতে পারলাম না। হিন্দু ধর্মে মূর্তি যদি নানা সংস্কারে গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতিও পায়, তাহলে তা তাদের পূজায় থাক্না, এ নিয়ে এক শ্রেণীর মুসলমানের কাড়াকাড়ি কেন? এ কি অনধিকার চর্চা হয় না?

প্রসঙ্গত প্রাসঙ্গিক বিষয়েই একটি সংযোজন। শেখ হাসিনা তার শাসনামলে পিতার ৬০ ফুট উঁচু মূর্তি গড়ে তার রূহের মাগফিরাতের না রূহের আযাবের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর জীবদ্দশায় পাবেন কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে তিনি এসব কর্মকাণ্ড দ্বারা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমানকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হোন, তা বেশ বুঝা গেল। কিভাবে বুঝা গেল, তা এখানে বলছি। ২০০২ সালের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি'র পক্ষকালব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর শুক্রবার দলের যুগ্ম মহাসচিব (জিয়াউর রহমানের বড় সন্তান) জনাব তারেক রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে ছাত্রদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন, দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে। তরুণ শিল্পীরা তারেক রহমানের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ম্যুরাল এবং ভাস্কর্য স্থাপনের দাবি জানান। এর জবাবে তারেক রহমান বলেন, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.nagorikpathagar.org

ক্যাম্পাসেই নয়, শহীদ জিয়াউর রহমানের কর্মজীবন নিয়ে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে এবং তা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হবে। (সূত্র : ৯ই নভেম্বর, ২০০২ তারিখে প্রকাশিত সকল জাতীয় দৈনিক)।

এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আমি যে মন্তব্য করেছিলাম তাও এখানে উল্লেখ করছি। আলোচনাটি ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান-এ ১৮-২৪/১২/২০০২ সংখ্যায়।

ভাল মন্দ যা কিছু হোক, সন্তান পারে মা-বাবার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু করতে। যেমন মা-বাবা সন্তানদের জন্য করেছেন। তবে উভয়েরই কাজের ধারা স্বতন্ত্র। একটি অপত্যস্নেহ থেকে আর অন্যটি পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে উৎপন্ন। যে উৎস ও এঙ্গেল থেকেই হোক, মূল কথা কল্যাণ, সহযোগিতা, সেবা, উপকার ও পারস্পরিক ভালবাসা, সেটা এ পক্ষ থেকেই হোক বা ঐ পক্ষ থেকেই হোক।

সন্তান তার পিতাকে ভালবাসে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মরহুম পিতার জন্য জীবিত সন্তান বা সন্তানরা অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু মরহুম পিতা দুনিয়াতে রেখে যাওয়া তার জীবিত সন্তানদের জন্য কিছুই করতে পারেন না, করার যা ছিল, জীবিত থাকতে করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, জীবিত সন্তানরা মরহুম পিতার জন্য কি কি করতে পারেন? হ্যাঁ, অনেক কিছু করতে পারেন। এই করার ব্যাপারটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায়, যেমন অকল্যাণের দিক, সন্তানরা নানা অপকর্ম করে মরহুম পিতার মরণোত্তর আযাব বাড়িয়ে দিতে পারে। এই অপকর্ম বহু প্রকার এবং বিচিত্র। এ হতে পারে সন্তানের অসামাজিক আচার-আচরণ ও নানা কর্মকাণ্ড দ্বারা। জীবিত থাকতে যে পিতা ছিলেন প্রচুর সুনামের অধিকারী, সন্তান বা সন্তানদের খারাপ চরিত্রের কর্মকাণ্ডের কারণে মরহুম পিতা সমাজের কাছে নিন্দনীয় বলে গৃহীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। লোকে বলবে, লোকটি ভাল ছিল। কিন্তু চরিত্রহীন সন্তান রেখে গেছেন। মোটকথা পিতার সুনাম সন্তানরা পারে দুর্নামে পরিণত করতে।

www.nagorikpathagar.org

সচ্চরিত্রবান তথা ভাল সন্তানরা পিতার মৃত্যুর পর পিতার অনেক উপকারে লাগতে পারে। সন্তানরা সৎকর্ম দ্বারা পিতার সুনাম বাড়িয়ে দিতে পারে, আবার কমাতেও পারে, গুনাহ মাফের নিমিত্ত হতে পারে, জান্নাতুল ফেরদাউস নসীবের ওসিলা হতে পারে। সৎ ও সুন্দর আমল দ্বারা পিতার আখেরাতের পুঁজি বৃদ্ধি করতে পারে।

এবার জনাব তারেক রহমানের কাছে আসা থাক। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কল্যাণ নিশ্চয়ই তিনি চান। তারেক রহমান জানেন কিনা তা আমি জানি না, তাঁর মরহুম পিতার জন্য আখেরাতের মুক্তির সঞ্চয় তারেক রহমান দুনিয়া থেকে প্রেরণ করতে পারেন। প্রত্যেক মুসলিম মরহুমের জন্য তা বিশেষ প্রয়োজন। সন্তান হিসাবে তার পিতাকে এ সাহায্য করা সন্তানের জন্য ফরজ। এখন তাকে নতুনভাবে ভাবতে হবে, তাঁর মরহুম পিতার মূর্তি ৬ বিভাগে ৬টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক একটি নির্মাণ করলে আখেরাতের বাসিন্দা পিতার কোন উপকারে লাগবে? উপকারে লাগবে দ্বীন সমর্থিত কিছু, যা সদকায়ে জারিয়া ধরনের কাজ, যত দিন অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন মরহুম পিতার রূহের মাগফিরাতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে, তা জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ভাল। তবে শহীদ পিতার সঙ্গে মূর্তি ম্যুরাল বা ভাস্কর্যের দূরতম সম্পর্কও নেই বরং দুয়ের অবস্থান দুই বিপরীত দিগন্তে, মধ্যখানে সীমাহীন ফারাক। আমি যত দূর জানি, তার পিতার সংস্কৃতি কখনো মূর্তি সংস্কৃতি ছিল না। জীবিত থাকতে পিতার যা পছন্দনীয় ছিল না, তার ইন্তেকালের পর তারই অপছন্দনীয় কিছু তার রূহের ওপর বোঝা হিসাবে রাখা সন্তানের জন্য কতটুকু শোভন ও সওয়াবের বা আযাবের কাজ হবে, আবার ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সন্তানদের, মা-বাবা এবং দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে যা বলেছেন পাক কুরআনে উল্লেখ আছে। কারণ, এ দু'টি বস্তু অর্থাৎ সন্তান ও সম্পদ আল্লাহর স্মরণ থেকে অনেককে গাফিল রাখার বিশেষ ক্ষমতা রাখে।

শহীদ জিয়াউর রহমান বিশেষ করে এই দু'টি ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও সচেতন

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁর পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়েছে। সঞ্চয়ের দ্বারা ব্যক্তিগত ভান্ডার ভরে তুলতে পারতেন, সে সুযোগ-সুবিধা তাঁর ছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন লোভ-লালসা ছিল না, দুর্নীতি তাঁকে স্পর্শ করেনি। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাংক একাউন্ট দেখে। তাই তিনি গরিবই থাকেন কিন্তু সুনামের কাঙাল তো ছিলেনই না বরং ছিলেন খুবই সংযমী, যা এই চরিত্রবান পিতার মধ্যে দেখা যায়। তার সন্তানেরা তার ইন্তেকালের সময় পরিণত বয়সের ছিল না, আর ছিল না উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রচুর ধন-সম্পদ। আল্লাহর স্মরণ থেকে তিনি গাফেল ছিলেন না। ধনে দরিদ্র হওয়ার কারণে রাজনীতিতে তার প্রক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায়ই ভাঙ্গা সুটকেস ও ছেঁড়াগেঞ্জির রেফারেন্স টেনে টিটকারী বা উপহাসমূলক কথা বলে থাকেন।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, পিতা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না থাকলেও তার সন্তান পিতার চিন্তা-চরিত্র থেকে যেমন দূরে সরে পড়েছেন, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকছেন, অপরদিকে পিতার জন্য দুনিয়াতে আযাব সঞ্চয় করে আখেরাতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন। এ অত্যন্ত আপত্তিকর সিদ্ধান্ত এবং গর্হিত কাজ, দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের দিক থেকেও। টাকা আছে, পিতার জন্য বিনিয়োগ করবেন, ভাল কথা। তাই করুন। তবে এখন তার জন্য যা হয় লাভজনক, আখেরাতে চলে, সেই খাতে তো বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু তা করছেন না কেন, আমি বুঝতে পারছি না। হয়তো তারেক রহমান জানেন না, মরহুম পিতার জন্য কি কি করা যায়, ভালো কোন আলেমের থেকে জেনে নেবেন। একটু চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝতে পারতেন, সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে নিশ্চিত শহীদ পিতার অমঙ্গল হবে।

শেখ হাসিনা তার পিতার সন্তান, আপনিও আপনার পিতার সন্তান। শেখ হাসিনা তার পিতা ও অন্যান্যের মূর্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়া ভরে তুলেছেন। আপনিও যদি তাই করেন, তাহলে তার আর আপনার মধ্যে পার্থক্য কি থাকলো? আপনার বরং তাই করা উচিত, যা আপনার পিতার রূহের মাগফিরাতের জন্য দরকার। যত পারেন, এ ক্ষেত্রে খরচ করুন। আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তানের এটাইতো আদর্শ কাজ। ৬ বিভাগে ৬টি মূর্তি নির্মাণ না করে ৬টি মসজিদ নির্মাণ

www.nagorikpathagar.org

করলে কি ভাল হয় না? মুসল্লিরা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করবে, পিতার সওয়াব রেসানীতে সহায়ক হবে। ইচ্ছা করলে মূর্তির বদলে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। আমার কথা আমি বললাম। এ প্রস্তাব গ্রহণ করা না করা আপনার ব্যাপার। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রামাণ্য পুস্তকে বলা হয়েছে, শুধু দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরির নামই মূর্তি নয়, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এমন গভীর থাকে, যার ফলে আমরা তাতে সীমা লংঘন করে এবং কখনো অযৌক্তিকভাবে যুক্ত হয়ে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর আকৃতি গড়ে তুলি, তাও মূর্তি।

মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়ার কলা-কৌশল একই। মূর্তি নামে যা গড়া হয় তার মধ্যে মুখ্য থাকে ধর্মীয় মনোযোগ আর বিশ্বাস। কিন্তু ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোযোগ বা বিশ্বাস মুখ্য থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে যে বাদ যায়, তাও বলা যায় না। ভাস্কর্যে যখন ভাস্করের বা বিশেষ মহলের অথবা উদ্যোক্তাদের প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি খোদাই হয়ে দর্শকদের সামনে ভাসে, আর তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তখন আর একে ভাস্কর্য বলা যাবে না, সেটা মূর্তি হয়ে যায়।

জনাব তারেক রহমানের বিবেচনার জন্য মূর্তি ও ভাস্কর্যকে রাখলাম, আর রাখলাম মসজিদ। তিনি কোন্‌টা গ্রহণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন। তবে অনুরোধ করি, পিতার ওপর আযাব বাড়াবেন না পুত্র হয়ে।

www.nagorikpathagar.org

ভ্যালেন্টাইন সংস্কৃতি

[ভ্যালেন্টাইন কারো নাম থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু এখন এর অর্থ হয়েছে ভালবাসা, প্রেম, প্রেমিক-প্রেমিকা। পশ্চিমা দেশগুলোতে এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে শুধু উপহার বিনিময়ই হয় না, বন্ধুজন, স্বজন, আত্মীয় এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাবার দ্রব্য সামগ্রী, বই, ছবি এবং অনেক কিছু। 'Be my valentine' লেখা কার্ডও উপহার দেয়া হয়। মিষ্টি ও ফুলও উপহারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিন স্কুলের ছাত্ররা তাদের ক্লাস রুম সাজায় ও অনুষ্ঠান করে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ বিভিন্নভাবে এবং নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে। গ্রেটব্রিটেন এবং ইতালিতে কিছুটা ব্যতিক্রম স্টাইলে দিবসটি উদযাপিত হয়। গতানুগতিক আনন্দ অনুষ্ঠান ছাড়াও এই দু'টি দেশের কুমারী মেয়েরা সূর্য উদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম থেকে ওঠে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারা মনে করে, প্রথম যে লোককে তারা দেখে এবং যে লোক তার দিকে তাকায়, বিয়ে তারই সাথে হবে।]

www.nagorikpathagar.org

ভ্যালেন্টাইন দিবস বা ভালবাসা দিবস। প্রেম আদান-প্রদান দিবস বা প্রেম বিনিময় দিবসও বলা যায়, অথবা বলা যায় বছরে মাত্র একটি দিন ও রাত প্রেম সরোবরে ডুব দেয়া, সাঁতার কাটা, চরিত্রের নৈতিক ভূষণ খুলে প্রেম সরোবরের সলিলে যুগলদের হারিয়ে যাওয়ার দিবস 'ভ্যালেন্টাইন দিবস'। বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইনের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয় প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারী। ৩৬৪ দিন প্রেমের মলয় বা সমীরণ বহে, প্রেম রিহার্সেল চলে, আর ১৪ ফেব্রুয়ারী প্রেমের নাটক মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে পরে আসছি। এর আগে ভ্যালেন্টাইন নিয়ে আলোচনা করা যাক। নানা কথা আছে এই দিবস নিয়ে। এক এক করে আলোচনায় আসি।

ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে দু'জন খ্রিস্টান সাধুর নাম। তাদের মৃত্যু তিথিতে (১৪ ফেব্রুয়ারী) পাখিরা নিজ নিজ সঙ্গী নির্বাচন করে বলে রূপ কথায় বর্ণিত আছে।

এই দিনে বরকনে নির্বাচন করা হয়। ভ্যালেন্টাইন দিবসের (১৪ ফেব্রুয়ারী) কর্মসূচির মধ্যে আছে চিঠি বা উপহার বিনিময়, পাখির প্রেম সঙ্গীতও এই দিনে শুরু হয়।

অন্য তথ্য আছে : Valentine = A sweet-heart selected or got by lot on St., Valentine Day, 14th February; a letter or missive of an amatory or satirical kind, sent by one young person to another on St.-valentine Day.

'ভ্যালেন্টাইন ডে'-এর পটভূমিতে পাওয়া যায় এসব তথ্য, মর্ম ও কথা। এছাড়া আরও কত কথা আছে যা শুমার করাই মুশকিল। কথিত আছে, খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম দিকে রোমের কোন এক গীর্জার দু'জন সেন্ট (সাধু)-এর নাম ছিল ভ্যালেন্টাইন। তাদের দু'জনের মস্তক কর্তন করা হয় নৈতিক চরিত্র নষ্ট করার অপরাধে। তাদের মস্তক কর্তনের তারিখ ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভক্তেরা তাদের 'শহীদ' আখ্যা দেয়। রোমান ইতিহাসে শহীদের তালিকায় এই দু'জন সেন্টের নাম রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, একজনকে রোমে অন্যজনকে ইন্টারামনায় 'শহীদ' করা হয়। ইন্টারামনার বর্তমান নাম Terni, রোম থেকে ৬০ মাইল (৯৭ কিলোমিটার)

www.nagorikpathagar.org

দূরে। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন না। তবুও বলা হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব ও মৃত্যু সম্পর্কে। এমন কি এ দাবি করা হচ্ছে যে, ২৬৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লাউডিয়াস দ্যা গথ-এর আমলে নির্যাতনে ওদের মৃত্যু ঘটে। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রোমে তাদের সম্মানে এক রাজপ্রাসাদ (Basilica) নির্মাণ করা হয়। ভূগর্ভস্থ সমাধিতে একজনের মৃতদেহ আছে বলে অনেকে মনে করেন।

অন্য এক তথ্যে জানা যায়, ইন্টারামনা গীর্জার বিশপ রোমে শহীদ হন। তাকে ইন্টারামনা ও রোমে একই দিনে স্মরণ করা হয়ে থাকে। ভ্যালেন্টাইন সেন্ট একজন, দু'জন নয়। ইংরেজ কবি Geoffrey Chaucer তার এক কবিতায় ভ্যালেন্টাইন সেন্টকে স্মরণ করেছেন এবং বলেছেন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাখিরা তাদের সাথী বেছে নেয়।

ভ্যালেন্টাইন কারো নাম থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু এখন এর অর্থ হয়েছে ভালবাসা, প্রেম, প্রেমিক-প্রেমিকা। পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এই দিন শুধু উপহার বিনিময়ই হয় না, বন্ধুজন, স্বজন, আত্মীয় এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাবার দ্রব্য সামগ্রী, বই, ছবি এবং অনেক কিছু। 'Be my valentine' লেখা কার্ডও উপহার দেয়া হয়। মিষ্টি ও ফুলও উপহারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিন স্কুলের ছাত্ররা তাদের ক্লাস রুম সাজায় ও অনুষ্ঠান করে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ বিভিন্নভাবে এবং নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে। গ্রেটব্রিটেন এবং ইতালিতে কিছুটা ব্যতিক্রম স্টাইলে দিবসটি উদযাপিত হয়। গতানুগতিক আনন্দ অনুষ্ঠান ছাড়াও এই দু'টি দেশের কুমারী মেয়েরা সূর্য উদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে। ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারা মনে করে, প্রথম যে লোককে তারা দেখে এবং যে লোক তার দিকে তাকায়, বিয়ে তারই সাথে হবে। উইলিয়াম সেক্সপিয়ার তার হ্যামলেট নাটকে (১৬০৩) অপেলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

Good morrow! Tis st. valentine's Day
All in the morning betime,

www.nagorikpathagar.org

And I a maid at your window,
To be your valentine!

নানা পণ্ডিতের নানা মত। কেউ কেউ বলেন, ভ্যালেন্টাইন বলতে কিছু নেই। প্রাচীন রোমে 'লুপারকালিয়া' নামে একটি ভোজ অনুষ্ঠান এই তারিখে হতো। ভ্যালেন্টাইন নামের কোন বিশিষ্ট বিশপ প্রথমে এর উদ্বোধন করেন। সেই থেকে এর নাম হয়েছে ভ্যালেন্টান, তা থেকে দিবস আর দিবস উদযাপন ও নানা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আইটেম একের পর এক এভাবেই বাড়ছে। অন্যরা এক বা একাধিক সেন্টের নির্মম ঘটনার সম্পৃক্ততাকে উড়িয়ে দেন না। আর এক দল ইংরেজ পণ্ডিত বলছেন,১৪ ফেব্রুয়ারী পাখিরা সাথী খুঁজে নেয়। আর এক দল বলছেন, বসন্ত ঋতু প্রেমের ঋতু। প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম নিয়ে মেতে উঠা স্বাভাবিক। এভাবে বিতর্ক বাড়ে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয় না।

প্রাচীনকালে রোমানরা লুপারকালিয়া নামে ভোজানুষ্ঠান করতো প্রতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারী। নেকড়ে বাঘের উপদ্রব থেকে যাতে সৃষ্টিকর্তা তাদের রক্ষা করেন, সেই মানত হিসাবে ছিল ভোজ অনুষ্ঠান। এই ভোজানুষ্ঠানের দিন তরুণরা গরুর চামড়া দিয়ে একে অন্যকে আঘাত করতো। মেয়েরাও উৎসবে মেতে উঠতো। রোমানরা ৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন জয় করে। এ কারণে ব্রিটিশরা অনেক রোমান অনুষ্ঠান গ্রহণ করে নেয়। অনেক গবেষক এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব Lupercalia অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন অনুষ্ঠানের একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন। তারিখের সংগে মোটামুটি একটা মিল আছে, আর আছে দু'টি অনুষ্ঠানের মধ্যে চরিত্রগত সাযুজ্য।

প্রাচীন খ্রিস্টান গীর্জায় দু'জন সেন্ট ছিলেন, না একজন সেন্ট ছিলেন, সেটাও বিতর্কিত। কথিত আছে, রোমান সম্রাট ২য় ক্লাউডিয়াস ২০০ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান জারি করেন। ফরমানটি ছিল এই, তরুণরা বিয়ে করতে পারবে না। অবিবাহিত তরুণরাই দক্ষ সৈনিক হতে পারে এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। ভ্যালেন্টাইন নামের এক তরুণ সম্রাটের আইন অমান্য করে গোপনে বিয়ে করে। কেউ কেউ বলেন, রাজকুমার এ আইন লংঘন করেন।

www.nagorikpathagar.org

অন্য এক কাহিনীও আছে। ভ্যালেন্টাইন ছিলেন প্রথম দিকের গীর্জার একজন ধর্মযাজক। তিনি অত্যন্ত আলাপী ও সামাজিক লোক ছিলেন। অনেক শিশু ছিল তার বন্ধু। সম্রাটের তরফ থেকে তাকে বলা হলো রোমান দেবতাকে পূজা করতে, কিন্তু ভ্যালেন্টাইন পূজা করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। শিশু বন্ধুরা তাদের প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে মনে খুবই দুঃখ পায়, কিন্তু তাদের ভালবাসায় ভাটা পড়েনি। তারা ভালবাসার পত্র লিখে জেলের এক জানালা দিয়ে ভ্যালেন্টাইনের কাছে প্রেরণ করতো।

কথিত আছে, ভ্যালেন্টাইন আধ্যাত্মিক চিকিৎসার মাধ্যমে এক জেলারের অন্ধ মেয়েকে সেরে তোলেন। আরও কত কাহিনী ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে লোক মুখে শোনা যায়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ গ্যালাসলাস ১৪ই ফেব্রুয়ারীকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন।

ইংল্যান্ডের মানুষ ১৪শ' শতাব্দীর শুরু থেকে ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপন শুরু করেছে। কয়েকজন ঐতিহাসিকের অভিমত, ভ্যালেন্টাইন দিবসে ইংল্যান্ডে প্রিয়জনের কাছে কবিতার চরণ প্রেরণের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালনের রেওয়াজ শুরু হয়। কিভাবে শুরু হয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চার্লস নামে ফরাসি দেশের একজন লোক ছিলেন। তিনি অর্লিন্স (Orleans) -এর ডিউক ছিলেন। ১৪১৫ সালে অজিনকোর্টের যুদ্ধে এই ডিউককে ইংরেজরা গ্রেফতার করে এবং ইংল্যান্ডে এনে কারাবন্দি করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভ্যালেন্টাইন দিবসে এই ডিউক তার স্ত্রীর কাছে ছন্দময় ভাষায় লন্ডন টাওয়ারের সেল থেকে পত্র লেখেন। ইংল্যান্ডে সেই থেকে ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপন শুরু।

১৭০০ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের কুমারীরা বর তালাশের জন্য আজব এক পদ্ধতি গ্রহণ করতো। কুমারীরা প্রতি বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে ছোট ছোট সাদা কাগজের টুকরায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত হবু বরের নাম লিখে মাটির ঢেলা দিয়ে জড়াতো। তারপর একটি গামলায় পানি দিয়ে তাতে ঢেলা জড়ানো সব ক'টি লেখা কাগজ

www.nagorikpathagar.org

ফেলতো। যেটি আগে ভেসে উঠতো, সে কাগজে যে নাম থাকতো, সে নামের মানুষকে ভাবতো হবু বর। তাকে পাওয়ার অপেক্ষায় এক বছর থাকতো।

১৭০০ শতাব্দীতে কুমারীরা বর তালাশের আর এক পদ্ধতি অবলম্বন করতো। চিরহরিৎ বৃক্ষের পাঁচটি পাতা সংগ্রহ করে ভ্যালেন্টাইন দিবস শুরুর প্রাক্কালে একটি পাতা বালিশের ঠিক মধ্যখানে গেঁথে রাখতো, আর চারটি পাতা ঘরের চার কোণাতে রাখতো। তারা মনে করতো, কপাল ভাল থাকলে ভ্যালেন্টাইন রাতে হবু বরকে স্বপ্নে দেখা যাবে। এভাবে তারা দিবসটি উদযাপন করতো।

মধ্য ইংল্যান্ডের একটি কাউন্টির নাম ডারবিশায়ার। সেই কাউন্টির তরুণীরা মধ্য রাতে দল বেধে ৩ থেকে ১২ বার চার্চ প্রদক্ষিণ করতো আর এই চরণগুলো সুর দিয়ে আবৃত্তি করতো প্রদক্ষিণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত :

I sow hempseed

Hempseed I sow,

He that loves me best,

Come after me now.

তারা মনে করতো, এ বার বার আবৃত্তি করলে রাত্রিতে প্রেমিকজন অবশ্য ধরা দেবে।

ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপনের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে সবদেশে একই ধারা ও রীতি কখনো ছিল না এবং আজও নেই। ভিন্নতাই সবচেয়ে বেশি পরীলক্ষিত হয়। পশ্চিমা দেশে এই দিনটি যদিও ভালবাসা দিবস হিসাবে তরুণরা পালন করে থাকে, কিন্তু তারা যতটা এ দিনটিতে প্রেম নিয়ে মাতামাতি করে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাতামাতি করে নানা অনুষ্ঠান নিয়ে। কারণ, ওদের দেশে সারা বছর প্রেমের হাট আর কেনাবেচা চলে, এ জন্য আলাদা প্রেম প্রেম খেলা করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। তবে আনুষ্ঠানিকতা ঐতিহ্য হিসাবে পালন করে বটে।

www.nagorikpathagar.org

আগেই বলেছি, দিবসটি উদযাপনের ক্ষেত্রে যুগে যুগে যেমন উদযাপনের স্টাইলে পরিবর্তন এসেছে, তেমনি পরিবর্তন এসেছে উপকরণ ও উপাচারেও। ১৮০০ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এ সব কার্ডে লেখা থাকতো যেমন ভাল ভাল কথা, আবার মন্দ কথাও, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকতো। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি- Many valentines of the 1800's were hand painted. Some featured a fat cupid or showed arrows piercing a heart. Many cards had satin, ribbon, or lace tri,m. Others were decorated with dried flowers, feathers, imitation jewels, mother of pearl, sea shells or tassels. Some cards as much as cost as $ 10.

১৮শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইনের মধ্যে বিনিময় হতো তাতে কোন কোন কার্ড অপমানজনক কবিতাও বহন করতো। যেমন :

'Tis all in vain your simpering looks,

you never can incline,

with all your bustles, stays and curls

to find a valentine.

এখানে উল্লেখ্য, ভ্যালেন্টাইন নামে রোমের ইতিহাসে বেশ ক'জন ছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন ছিলেন পশ্চিম রোমান সম্রাট। দু'জন ছিলেন বিখ্যাত। ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কিত মূল নিবন্ধটি প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক carol Bain-এর লেখা। ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপেডিয়ার 'ভি' খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠা থেকে ২৮০ পৃষ্ঠায় এ নিবন্ধ মুদ্রিত। আমি এই নিবন্ধ থেকেই তথ্য নিয়ে পাঠকদের সামনে হাজির করেছি।

এই তথ্য বহুল নিবন্ধের অনুবাদ করেও আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না, ভ্যালেন্টাইন কি? এটি কি রোমান কোন শব্দ না পদবি বা নাম? কখনো মনে হয়,

www.nagorikpathagar.org

ভ্যালেন্টাইন ল্যাটিন একটি শব্দ যার নাম প্রেম, ভালবাসা, প্রেমিক বা প্রেমিকা। কখনো মনে হয়, ভ্যালেন্টাইন রূপকথার রহস্য ঘেরা প্রেমের নায়ক, কখনো মনে হয় রাজার আইন লংঘনকারী এক তরুণ বিশপ, কখনো মনে হয় সবই ভুয়া, প্রেম প্রেম খেলা নামে বায়বীয় ব্যাপার-স্যাপার। ঘটনা যাই হোক, হোক তা কাল্পনিক, রূপকথা বা বাস্তব- এ নিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানরা কেন উন্মাতাল হয়ে থাকে বছরের বিশেষ একদিন? আমাদের কি রয়েছে তাতে? আমরা কিভাবে উন্মাতাল হই, দেশের বিভিন্ন দৈনিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর যে সচিত্র বর্ণনা থাকে, তা পাঠ করে দেখুন। ১৯৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত দৈনিক মানবজমিন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রতি বছরের প্রস্তুতি প্রায় একই থাকে। কোন বছর হয়তো কম বা বেশি। যেমন ১৯৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাত্র একটি গ্রুপের যে প্রস্তুতি ছিল তা দৈনিকটির স্টাফ রিপোর্টারের ভাষায় ছিল এই :

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে ওরফে 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' আজ। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী দ্বিতীয় দিবস। ভালোবাসাময় এ দিনটিকে ঘিরে ঢাকায় এবার বে-নজির প্রস্তুতি। এ লক্ষ্যে গঠিত উদযাপন পরিষদ হাতে নিয়েছে চমক দেয়া কর্মসূচি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মিলেছে দারুণ সাড়া। অন্তত ১শ' দম্পতি ও কপোত-কপোতী হাজির হবেন টিএসসিতে অনুষ্ঠানস্থলে। এদের মধ্যে থাকবেন চুটিয়ে প্রেম শেষে সদ্য বিয়ের পিঁড়িতে বসা দম্পতি। থাকবেন যাদের এখনো প্রেমের ভরা মৌসুম চলছে। এখনো বিয়ে করেননি তারাও। আরো থাকবেন ১২/১৫ বছর সংসার চালিয়ে প্রেমপ্রীতির লাগাতার একঘেয়েমিতে যারা ক্লান্ত, তারাও। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন পরিষদের সংগঠক আশরাফী খানম মিতু জানান, এ দিনে আমরা উপস্থিত করবো টিভি ও মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয়তাধন্য বেশ কিছু শিল্পী দম্পতিকে। টিএসসিতে আসা এ সব গুণী দম্পতি স্মৃতিচারণ করবেন তাদের দাম্পত্য জীবনের। এছাড়া তালিকাভুক্ত দম্পতিদের মধ্য থেকেও অনেকে বয়ান করবেন ভালোবাসার স্মৃতি। ভালোবাসা কমিটির ভাষ্যকার মিতু জানান, অনুষ্ঠান হবে দিনব্যাপী। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করবেন খ্যাতিমান আবৃত্তিকারগণ।

www.nagorikpathagar.org

গানও হবে। রাজধানীর ফুলের দোকানগুলোতেও ব্যাপক প্রস্তুতি। শাহবাগের পুষ্প দোকানিরা জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে 'হৃদয়খচিত' পুষ্পার্ঘ্যের অর্ডার মিলেছে অনেক। পার্সেল অর্ডারও প্রচুর। অর্থাৎ ফুল-হরকরার হাতে 'প্রিয়তম'র কাছে পৌঁছে যাবে 'ভ্যালেন্টাইন ফ্লাওয়ার'। দোকানিরা জানান, দোকানে প্রতিদিনকার যা আঞ্জাম, তার তুলনায় এদিন আমরা মজুদ রাখছি দ্বিগুণ পরিমাণ ফুল। বিশেষ করে হরেক কিসিমের গোলাপ।

এই দৈনিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সংখ্যায় একটি অনুষ্ঠানের যে বিবরণ ছাপা হয়, সে বিবরণ রচনা করেন মোশাররফ রুমী। শিরোনাম ছিল এই, 'সুরের মুর্ছনায় উদ্দাম ভালবাসা'। পরের লাইনে ছিল এ কথাগুলো, 'উষ্ণ আলিঙ্গন, চুম্বন বিনিময়, উদ্দাম নৃত্য, বলরুম পূর্ণ, রাত তখন দু'টা'। এই লাইনের নিচে ছিল বিশেষ অ্যাকশনে পুরুষ ও মহিলাদের অ্যাকশন ছবি। ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপনে মাতোয়ারা তারুণ্য'। এরপর ছিল মোশাররফ রুমীর রিপোর্ট :

উদ্দাম নৃত্য, সীমাহীন আনন্দ উল্লাস, তরুণ-তরুণীদের উষ্ণ আলিঙ্গন আর ভালবাসার চুম্বন বিনিময়ের মধ্যদিয়েই হয়ে গেলো প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের আয়োজনে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' ওরফে 'ভালোবাসা দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠান। বসন্তের প্রথম সন্ধ্যায় হোটেলের বলরুমে বসেছিলো তারুণ্যের এক মিলন মেলা। 'ভালোবাসা দিবস'কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজিয়েছিলেন বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয়েছিল বলরুমের অভ্যন্তর। 'ভ্যালেন্টাইনস : অ্যা স্যালিব্রেশন অব লাভ' শিরোনামে আয়োজন করা হয়েছিল জম্পেশ অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের সূচিতে ছিলো লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডিলিসাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। টিকিটের মূল্য 'কাপোল'দের জন্য ২৮০০ টাকা এবং সিঙ্গেল ১৫০০ টাকা। দেড়শ' কাপোল এবং একশ' সিঙ্গেল প্রেম পূজারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের মাইক্রোফোন ওপেন হয় রাত সাড়ে আটটায়। মঞ্চে আসেন সুদর্শন তরুণ রাবেত। তিনি উপস্থিত দর্শকদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তার আহ্বানে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য মঞ্চে আসেন স্যাটেলাইট চ্যানেল এমটিভি ইন্ডিয়ার প্রথম বাংলাদেশী ভিজে তাসলিমা রহমান। তন্বী তরুণী, দীর্ঘাঙ্গিনী। বেশ উচ্ছলও। মাইক্রোফোন ধরার ভঙ্গিতেই বোঝা গেলো, এ মেয়ে মাত করবেন। মুখ খুললেন তাসলিমা। অনর্গল ইংরেজিতে বেশ কিছুক্ষণ বললেন 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র আদ্যোপান্ত সম্পর্কে। মোহময়ী ভঙ্গিতে দেয়া তার বয়ানকালেই মঞ্চে এসে উদয় হলেন প্যাকেজ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'র নানা-নাতি পর্বের নাতি নিপু। নানা হাস্যরসাত্মক কথায় বেশ জমালেন তিনি। ভিজে তাসলিমাকে বানাতে চাইলেন ভ্যালেন্টাইনস পার্টনার। তাসলিমা তাতে অস্বীকৃতি জানালে মনের দুঃখে নিপু মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। দর্শক বেশ উপভোগ করলো পর্বটি। ঘড়ির কাটা তখন রাত ৯টার ঘরে। ভিজে তাসলিমা জানালেন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব 'মিউজিক'-এ মাতাতে আসছে মাইলস। দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালিতে মাইলস তাদের পরিবেশনা শুরু করে। একটানা রাত ১০টা পর্যন্ত তারা গেয়ে শোনায় উপভোগ্য ১০টি ইংরেজি গান। এর মধ্যে মাইলস-এর পঞ্চম পরিবেশনাতেই বলরুমের ডান্সফ্লোরে এসে ভিড় করে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। শাফিন ও হামিনের কণ্ঠ-মূর্ছনা ও ইলেক্ট্রিক ড্রামের উদ্দাম বিটের সাথে তারা মেতে উঠে নাচের উন্মাদনায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতোই যেন বর্ণিল সে মাতামাতি। একদিকে গান, অন্যদিকে লাইট ওয়েভস-এর মনোজ্ঞ লাইটিং আর তার সাথে নাচের উন্মাদনায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘড়ির কাঁটা গিয়ে ঠেকলো দশটার ঘরে। থামলো মাইলসের পরিবেশনা। ভিজে তাসলিমা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললেন ক্ষুধা লাগার কথা, ডিলিসাস ডিনারের কথা। আর তাতেই যেন সবার পেটের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণাটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এরপর এলো মজার মজার সব খাদ্য, আইসক্রিম ইত্যাদি। প্রেম-পূজারীরা রসিয়ে রসিয়ে খেলেন। ১১টায় শেষ হলো ডিনার পর্ব। তাসলিমা ঘোষণা করলেন, এবার শুধু মিউজিক নয়, মিউজিকের তালে তালে ম্যাজিক। সাথে ফ্যাশন মডেলদের মনকাড়া ফ্যাশন শো। ঘোষণার পর পরই তরুণ জাদুকর আলীরাজ মঞ্চে এলেন। সাথে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ফ্যাশন মডেল। শুরু হলো আলীরাজের একের পর এক

www.nagorikpathagar.org

মনোমুগ্ধকর সব জাদুর পরিবেশনা। সাথে নানা বর্ণিল পোশাকে ফ্যাশন মডেলদের মনোজ্ঞ ফ্যাশন ক্যাটওয়াক। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এ পর্ব। মুহুর্মুহু উল্লাস ধ্বনি আর হাত তালিতে দর্শকরা উপভোগ করলেন এ পর্বটি। আবার ভিজে তাসলিমা জানালেন চমকপ্রদ একটি সংবাদ। বললেন, 'এই প্রথম বাংলাদেশী পপ মিউজিকের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান এমটিভি ইন্ডিয়াতে অচিরেই প্রচার হতে যাচ্ছে। সেটারই প্রিমিয়ার দেখানো হবে এখন।' মঞ্চের দু'পাশে সেট করা সাইড স্ক্রিনে শুরু হলো অনুষ্ঠানটি। কিন্তু কারিগরি ত্রুটির কারণে তা আর এগুলো না। সে ত্রুটি সারানোর ফাঁকে ফাঁকে এরপর মঞ্চে আহ্বান জানানো হলো জাদুকর আলী রাজকে, সব ফ্যাশন মডেল এবং ফ্যাশন শো'র কোরিওগ্রাফার কান্তাকে। এরা মঞ্চে এসে পরিচিত হওয়ার পর ১১টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফেল ড্র পর্ব। এ পর্বে ঢাকা-কাঠমান্ডু-ঢাকা প্লেন টিকিট এবং তিন রাত ফাইভ স্টার হোটেলে থাকার পুরস্কারটি পান আসিফ নামে এক তরুণ। এছাড়া সর্বাপেক্ষা সুন্দর পোশাকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার পান ই ডব্লিউ খান ও মিসেস শওকত খান দম্পতি।

ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটার ঘরে। আবার মঞ্চে আসে মাইলস। দু'টি গান শেষে মঞ্চে আসেন ভিজে তাসলিমা। বলেন, কিছুক্ষণ আগেই বারোটা বেজে গেছে। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে। আজকে কি কারো জন্মদিন? কে আজকের বার্ডডে বয়। দয়া করে তিনি মঞ্চে আসুন। এ সময় মাইলস-এর মেইন ভোকাল শাফিন মৃদু হাসছিলেন। তাসলিমা এগিয়ে যান তার কাছে। জানতে চান আজ তার জন্মদিন কিনা। শাফিন বলেন, হ্যাঁ। অডিয়েন্স করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। ছোট্ট একটি কেক আনা হয় মঞ্চে। আহ্বান জানানো হয় শাফিনের স্ত্রীকে। তিনি মঞ্চে এসে স্বামীকে চুমু দেয়ার মাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। শাফিন কেক কাটেন। স্ত্রী তার মুখে তুলে দেন সে কেকের টুকরা। মাইলস-এর অন্য সদস্য শাফিনের ভাই হামিন বলেন, 'আসুন আমরা সবাই মিলে শাফিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।' তার সাথে সাথে পুরো অডিয়েন্স বলে ওঠে 'হ্যাপি বার্থডে টু শাফিন'। এর পর পরই মাইলস আবার শুরু করে তাদের পরিবেশনা। গান এবং

www.nagorikpathagar.org

ড্রামের দুর্দান্ত বিটের তালে ডান্স ফ্লোরে এসে ভিড় জমায় নাচ পাগল এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ও কয়েকটি তরুণ দম্পতি। এবারের নাচ পর্ব আগের চেয়ে আরো জমকালো হয়ে ওঠে। বিরামহীন গানের সাথে চলতে থাকে নাচ। নাচের তালে তালে নৃত্যরত তরুণ-তরুণী এবং দম্পতিরা নিবিড় হয়ে যায় উষ্ণ আলিঙ্গনে। দু'একজন প্রিয় মানুষটির ঠোঁটে ঠোঁট রেখেও ভালোবাসা বিনিময়ে মশগুল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন টেবিলে বসা দম্পতিরাও ভালোবাসার এই মহান দিবসে উষ্ণ চুম্বনের মাধ্যমে প্রিয়তমকে ভালোবাসা জানাতে মুখর হয়ে ওঠে। যেন দু'জনে হারিয়ে যেতে আজ কোনো বাধা নেই- এমন একটা আবহ তৈরি হয়ে যায় বলরুম জুড়ে। একে একে ছয়টি ইংরেজি গান গেয়ে পরিবেশনা শেষ করে মাইলস। এরপর খানিক বিরতি শেষে দু'টি ইংরেজি গান গেয়ে শোনান মডেল তারকা তুপা। তার গান শেষে শুরু হয় এমটিভিতে প্রচার অপেক্ষারত বাংলাদেশী পপ অনুষ্ঠানটির প্রিমিয়ার। সাইড স্ক্রিনের মাধ্যমে দর্শক উপভোগ করেন সোলস ব্যান্ডের নাসিম আলী খান, মাইল ব্যান্ড এবং এলআরবি ব্যান্ডের একটি করে গান। এরপর অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব রেকর্ডেড বিদেশী উত্তেজক মিউজিকের সাথে উদ্দাম নাচ। ডান্স ফ্লোরে বেড়ে যায় নাচিয়ের সংখ্যা। আগতদের সিংহ ভাগই অংশ নেয় সে নাচে। নাচের তালে তালে তরুণ-তরুণী আর দম্পতিদের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার অপূর্ব এক দৃশ্যপট ফুটে ওঠে বলরুম জুড়ে। রাত যতো বাড়তে থাকে সে ভালোবাসার উষ্ণতাও যেন আরো গভীর হয়। উষ্ণতাকে পরিপূর্ণতা দিতে প্রিয় মানুষের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে মৃদু চুম্বনেও নিবিষ্ট হন কেউ কেউ। শাসনের সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে প্রিয় মানুষকে ভালোবাসার পরশ বুলানোর এমন সব দৃশ্য রচিত হয়। আর এভাবেই কেটে যায় অনেক সময়। ঘড়ির কাটা তখন গিয়ে ঠেকেছে রাত দু'টার ঘরে। শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালোবাসার দিবস' বরণের অনুষ্ঠান।

রাজধানীতে ছিল যে দৃশ্য : ভালোবাসায় মাতোয়ারা ছিলো ভালোবাসা দিবসের রাজধানী। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, আশুলিয়া, বিমানবন্দর সংলগ্ন ওয়াটার ফ্রন্ট, চারুকলার বকুলতলা, সর্বত্র ছিলো

www.nagorikpathagar.org

প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। গতকাল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাজির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

প্রিয়তমার জন্য ষাঁড়ের মাথায় লাল কাপড় বাঁধা নয়, জগত সঙসার টুঁড়ে একশ' আটটি নীল পদ্ম খোঁজা নয়, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে একদল ব্যর্থ প্রেমিক অংশ নিয়েছেন অনশনে। এক পর্যায়ে খেয়েছে বেরসিক পুলিশের তাড়া। টিএসসি এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ভালোবাসা র‍্যালি। গতকাল বিকেলে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতিচারণে তারা অংশ নেন। সন্ধ্যায় দারুণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে এ আয়োজন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বকুলতলা ও টিএসসির ভেতরে কয়েকশ' জুটি সকাল থেকেই বসেছিলো দল বেঁধে। তরুণীদের পরনে ছিলো হলুদ শাড়ি, খোঁপায় গাঁদা ফুল গোঁজা। হাতে ছিলো গোলাপ। শাহবাগ, কাঁটাবনসহ রাজধানীর ফুল বিপণিগুলোতে বিক্রি ছিলো রেকর্ড পরিমাণ। দুপুরের পর গোলাপ ছিলো দুষ্প্রাপ্য। প্রেমিকরা ফুল হাতে লাইন দিয়েছিলো ক্যাম্পাসের মেয়েদের হলের সামনে। বইমেলাতেও ঢেউ খেলেছিলো। সেখানেও চলেছে সহাস্য জুটির দৌরাত্ম্য। বিকেলে টিএসসিতে জমে ওঠে 'ভালোবাসা ছাড়া আর আছে কি' শীর্ষক রম্য বিতর্ক।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে গতকাল আট বন্ধু মিলে নেমে পড়েছিলেন না খেয়ে দিন কাটানোর প্রতীকী যুদ্ধে। ওরা সবাই ব্যর্থ প্রেমিক। ওদের দাবি, ওরা আট বন্ধু আটজন নারীকে ভালোবাসতো। কিন্তু এখন ওই নিষ্ঠুর মেয়েরা আর তাদের ভালোবাসে না। এই প্রেমহীনতার বিরুদ্ধে তারা অনশনে অংশ নেন। তারা বলছেন, এই প্রতীক অনশনে যদি তারা ফিরে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে আরো কর্মসূচি দেয়া হবে। কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে তারা ওই রমণীদের ভালোবাসা ফিরে পাবে বলে তাদের বিশ্বাস। আট প্রেমিক পৃথক পৃথকভাবে মানবজমিন'কে জানান, ওদের ভালোবাসাকে, হৃদয়-মনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে আটজন পাষাণী। গতকাল এই প্রেমিক দল প্রেসক্লাব চত্বরে

www.nagorikpathagar.org

কালো ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যানারে লেখা ছিলো, 'তানিমা, হে, তব তরে প্রতীক অনশন আজি ভালোবাসা দিবসে।'

ব্যর্থ প্রেমিকরা '৯৮ সালে নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। এখন বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, মেডিকেল, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের পড়াচ্ছেন। আটজনের প্রেমিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রফিকুল ইসলাম সুমন। সুমন বলেন, 'আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়ার পর একটি অনুষ্ঠানে পরিচিত হই তনিমা নামের একটি মেয়ের সাথে। পরিচয়ের পর থেকেই ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অপরকে ভালোবাসতে থাকি। আমি ও তানিমা ভর্তি হই শুভেচ্ছা কোচিং সেন্টারে। তিনি বলেন, হৃদয়-মন উজাড় করেই তানিমাকে আমি ভালোবাসতে থাকি- স্বপ্ন দেখি, ঘর বাঁধার। কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙে দেয় তানিমা। ও আমাকে হঠাৎ করেই এড়িয়ে চলতে শুরু করে। মাত্র কয়েক দিন আগে সত্যি সত্যিই তানিয়া আমার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়ে দিলো। কিন্তু আমি তানিয়াকে নিয়ে এখনো স্বপ্ন দেখি। আমি তাকে ভুলিনি। আমার বিশ্বাস তানিয়াকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় সুমন দেবেন আরো কঠোর কর্মসূচি।

আট প্রেমিকের অন্যতম একজন হলেন ইমরান পারভেজ পলাশ। তিনি একই ধরনের অভিযোগ এনে বলেন, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। সেই নবম শ্রেণী থেকে তার সাথে পরিচয়। তার নামের প্রথম অক্ষর 'ঈ'। কিন্তু এইচএসসিতে এসে 'ঈ' আর আমাকে ভালোবাসে না। তখন থেকেই আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে যাই তার জন্য। আমি এই ভালোবাসা দিবসে 'ঈ'কে পেতে চাই। তার কথা মতো, ডাক্তারি পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু যদি তাকে না পাই তাহলে ডাক্তারি পড়া হবে বৃথা। 'ঈ'-এর জন্য পলাশ সিগারেট ছেড়েছিলেন। কিন্তু আজ হারিয়ে গেছে প্রিয় সে মুখ। পলাশের প্রশ্ন একটাই, আমাকে কেন যন্ত্রণায় রেখে 'ও' অন্যত্র বিচরণ করছে? সাহেদ কামাল জুয়েলের মুখ গম্ভীর। প্রেসক্লাবের সামনে বসে বার বার বলছিলেন, একজন তানিমা নয়, আটজন তানিমার নাম আজ আমাদের হৃদয়ের গভীর কোণে। আমরা তানিয়াদের এই ভালোবাসা দিবসে

www.nagorikpathagar.org

জানাতে চাই 'তোমরা ফিরে এসো। আমরা তোমাদের জন্য দরজা-জানালা খুলে বসে আছি।' প্লিজ, তোমরা আমাদের হৃদয়ের ডাল-পাতা ও ফুল-ফলে ভরে দাও।

আলমগীর কবির হেসে হেসে বললেন, এই প্রতীক অনশন করে আমরা বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই, 'আমরা প্রেমিক।' তিনি বলেন, 'দিশার' প্রেম আমার হৃদয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি তাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।

সাইদুর রহমান মতিঝিল কলোনিতে ভালোবেসেছিলেন জয়ন্তিকে। কিন্তু জয়ন্তি ভুলে গেছে সাইদুরকে। জয়ন্তি এখন তার নামও শুনতে পারে না। সাইদুর আরো জানান, 'ওর মা-বাবার ইচ্ছা তাকে ডাক্তার বানিয়ে বিয়ে দেবে। এর আগে কারো সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে দেবে না। আমি শুধু জয়ন্তির ভালোবাসা চাই। ডাক্তার হয়েও যদি আমার কাছে ফিরে আসে তাহলেই আমার সার্থকতা।

রাকিব হাসান তান্না গতকাল মানবজমিনকে মফস্বলের একটি জেলা শহরের নাম করে বলেন, এখানে জন্ম নিয়ে পাপ করিনি। কিন্তু আমার ভালোবাসার মানুষটির পরিবার ও জেলার লোকদের দেখতে পারে না। তাদের থেকে এ ধরনের আচরণ আশা করিনি। তিনি বলেন, ধানমন্ডিতে বাড়ি-গাড়িসহ থাকছি। তিথিকে ভালোবেসে ফেলি গত বছরের জানুয়ারির ১৫ তারিখে। একে অপরকে খুব কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু কাল হলো আমি একটি বিশেষ জেলার ছেলে। তিথির মা স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভালোবাসো, বাধা নেই, কিন্তু ওই জেলার ছেলেকে নয়।

গতকার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিরহ যন্ত্রণায় কাতর ৮ যুবকের সাথে সব চাইতে বেরসিক আচরণ করেছে প্রেমহীন পৃথিবীর পুলিশ। পুলিশের যুক্তি ছিলো, যেখানে সেখানে ব্যানার ঝুলিয়ে, রাস্তায় জটলা করে, ট্রাফিক জ্যাম তৈরি করছেন তারা। টঙ্গীর আশুলিয়া এবং বিমানবন্দরের পাশের ওয়াটার ফ্রন্টে গতকাল ঢল নেমেছিলো কপোত-কপোতির। 'ভ্যালেন্টাইন ডে'তে তারা পরস্পর ভালোবাসা বিনিময় করেছে, হৃদয়ের উষ্ণতায় হারিয়ে গেছে একে অন্যের মাঝে।

বিমানবন্দরের ওয়াটার ফ্রন্টে অসংখ্য জুটির ভিড় জমেছে গতকাল। হ্রদে নৌকায় চড়ে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা মেরে ভালোবাসার কথা বিনিময় করেছে

www.nagorikpathagar.org

তারা। ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ বললেন, 'আজ আমাদের হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' ওয়াটার ফ্রন্টের দোকানি বললেন, আজ জুটির ভিড় বেশি। বিক্রি বেশি। বিমানবন্দরের ফুলের দোকানি জানান, ফুলের বিক্রি হয়েছে বেশি। ফুলের মধ্যে গোলাপ আর রজনীগন্ধার কাটতি বেশি। ওয়াটার ফ্রন্টের চটপটি বিক্রেতা মামুন জানান, গত বছরের এমন দিনে বিকেলে অনেকে আসলেও সকালে তেমন একটা আসতো না। তবে এ বছর দেখি সকালেই ভিড়।

টিএসসিতে ভালোবাসা দিবস উদযাপন পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো স্মৃতিচারণ, আবৃত্তি এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। গানে অংশ নেন হেমন্ত কণ্ঠি গায়ক ডাব্লিউআর তৌহিদ। অনুষ্ঠানে বেশ কিছু তরুণ-তরুণী তাদের ভালোবাসার প্রথম সময়ের প্রেম পর্বের স্মৃতিচারণ করেন। এর মধ্যে কয়েকজন দম্পতি তাদের স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণে একাধিক দম্পতি বলেন, তাদের প্রেম পর্বের শুরুটা খুব ভালো ছিলো না, অভিভাবকদের পাশাপাশি বড় ভাইদেরও এড়িয়ে প্রেম করতে হতো। দেখা মিলতো না তেমন। যে দিন দেখা হতো সে দিন যেন হতো আজ ভালোবাসার দিন। '৮০-র দশকে প্রেম করে বিয়ে করেছেন এমন একজন দম্পতি বলেন, আমরা বিয়ের আগে প্রেম করতে পারিনি। কিন্তু বিয়ের পরে আগের সব কষ্ট পুষিয়ে নিয়েছি। এ কারণে খেদ নেই তেমন। টিএসসির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরের অনুষ্ঠানে বহু তরুণ-তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

এই তো হলো আমাদের দেশে ভ্যালেন্টাইন বা লাভ ডে উদযাপনের নমুনা। কার পাগলকে কে দুধকলা দিয়ে পোষে, একবার চিন্তা করে দেখুন। ভ্যালেন্টাইন কে? সেন্ট না শয়তান, না রূপকথার কোন নায়ক, আসলে ভ্যালেন্টাইন কি বা কে, ঘটনার সতের/ সাড়ে সতের শ' বছর পরও নিশ্চিত হওয়া গেল না, অথচ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করেছেন! কি আজব তামাশা! ভালবাসা তাদের সোনারগাঁও হোটেলে, টিএসসি এলাকায় এসেছে। নিজেদের ঘর সংসারে ভালবাসা নেই! কেন আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা না বুঝে না জেনে লাফাতে যান? তারা যে অনুকরণপ্রিয় প্রাণী বাঁদরের জাত বংশ, তা কি প্রমাণ করার জন্য?

www.nagorikpathagar.org

আমাদের আহাম্মকরা বাঁদর জাত হওয়ার কারণে বুঝতে পারছে না, মানুষ জাত হলে বুঝতে পারতো যে, ইংরেজি লাভ (Love) বাংলায় লোকসান। ওদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম, মা-বাবা, ভাইবোন হারাবার নাম ভালবাসা। নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়া। তাদের ভালবাসার পরিণতি 'ধর ছাড়' আর 'ছাড় ধর' স্বামী-স্ত্রী। এই ধরা-ছাড়ার পালা চলতে থাকে। আমাদের বাঁদর-বাঁদরানীরা নিশ্চয়ই পশ্চিমা সমাজকে চেনে জানে, কিন্তু তবুও পশ্চিমা মোহে ওরা মোহাবিষ্ট হয়ে আছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে তবুও বলছে, আওর এক গ্লাস লাও।' এই মোহময়তা হেরোইনের নেশার চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নয়।

রোমের উৎসবে ইংল্যান্ড জেগে উঠে, আমেরিকা জেগে উঠে, গোটা ইউরোপ জেগে উঠে। জেগে উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, এক জাত, এক সভ্যতা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম এবং একই ধারার সংস্কার। এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই আনন্দ-বেদনার অনুভূতি সর্বত্র। কিন্তু আমাদের দেহ পৃথক, ওদের চেয়ে আমরা পৃথক প্রায় সব ক্ষেত্রে, এতদসত্ত্বেও কেন আমরা নাচি যখন তারা ডুগডুগি বাজায় নিজেদের জন্য।

লন্ডন থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৯৫) রয়টার পরিবেশিত খবর ছিল এই, ১৪ ফেব্রুয়ারি মিলনকাঙ্ক্ষী শতাধিক যুগল ভ্যালেন্টাইন দিবসে লন্ডনে চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ওই দিনের অন্যান্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

আমাদের দেশেও ভ্যালেন্টাইনরা রাত গভীরে একই ভাবে বিলাতের ভ্যালেন্টাইন ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকে। এবার বলুন, তাদের ও আমাদের মধ্যে ফারাক থাকলো কি? আমরা যে মুসলমান, ভ্যালেন্টাইন আমাদের নয়, ওদের, এই জ্ঞানটুকুও নেই, এটাই আমাদের জন্য বড় ট্র্যাজেডি।

www.nagorikpathagar.org

অসুন্দর চরিত্রের সুন্দরী প্রতিযোগিতা

[সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইসলাম সমর্থন তো করেই না, বরং এ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে। কুৎসিৎ হওয়ার কারণে যেমন দুঃখ বোধ করার কোন কারণ নেই, সুন্দর বা সুন্দরী হওয়ার জন্য সৃষ্ট জীবের কোন বড়াই নেই। কুৎসিৎ আর সুন্দর হওয়ার ব্যাপারটা যদি বান্দাহর হাতে থাকতো, তাহলে সবাই সুন্দরই হতো। নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার প্রথম দায়িত্ব নারীর। নারী সৌন্দর্য পণ্য নয়, বেচাকেনার বস্তু নয়, প্রদর্শনীর জন্য এ সৌন্দর্য নয়। 'আমি সুন্দর' এ নয় আমার অহংকার। আল্লাহ আমাকে সুন্দর অবয়বে ও রূপে সৃষ্টি করেছেন, তার শুকরিয়া আমি আদায় করি কৃতজ্ঞতার সেজদায়। যদি তাতে আমার অহংকার বোধ হয়, তাহলে আমি এই অংকার আঘাতহানী 'আল হামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করে। সকল অহংকার আর প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এই হোক সকল সুন্দরী, বিশেষ করে মুসলিম সুন্দরীদের অন্তরের কথা।]

www.nagorikpathagar.org

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ্বে শুরু হয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। আয়োজক পুরুষরা। মহিলাদের নিয়েই হয়ে থাকে এ প্রতিযোগিতা, পুরুষদের নিয়ে হয় না। আল্লাহতাআলা কি সৌন্দর্য শুধু নারীদেরই দিয়েছেন? যদি উভয়কে দিয়ে থাকেন, তাহলে এ প্রতিযোগিতায় কেন পুরুষ নেই? আয়োজনে দেখা যায় শুধু পুরুষ। কেন? মতলব জঘন্য, ঘৃণ্য এবং সর্বাংশে যৌন। পশ্চিম বা পূর্বের, উত্তরের বা দক্ষিণের যারা যৌন বিকারগ্রস্ত, যাদের মন-মগজ-মেধা-চোখ যৌনতায় আক্রান্ত, তারা পুরুষের সৌন্দর্যকে কোন বিষয় বলে মনে করেন না। কারণ, পুরুষ দিয়ে কোন যৌন আসর বসাতে পারেন না, আসর জমে না। ওদের দিয়ে তাদের ইবলিসী ইচ্ছা চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না, শুধু সমকামিতার অঙ্গনে কিছু লোককে ব্যবহার করা যায় মাত্র। এ প্রবণতাও আবার সকলের নেই। কিন্তু নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাম ও অবয়ব কিছুই ফেল্‌না নয়। খ্রিষ্টান প্রাচীন ধারণায় নারীরা শয়তানের বাহন। নারী শুধু ভোগের সামগ্রী। যৌনতার বাজারে ওদের মত উমদা পণ্য আর নেই। এ জন্য বিকারগ্রস্ত পুরুষ আয়োজকরা নারী নিয়ে শুধু মাতামাতি করে, নারী নিয়ে হাটবাজার খুলে, নারী নিয়ে নারী দিয়ে যৌন উৎপাদনের বিশ্ববাজার সম্প্রসারণে তারা ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, সে বাজার ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দেশ বাংলাদেশেও তাদের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। তাদের কাছে নারী যে ভোগের সামগ্রী, তা তারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট খুলে হাতেনাতে প্রমাণ করে দিচ্ছে। ওদের প্রোগ্রামে কোন পুরুষ আইটেম নেই, প্রাকৃতিক সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা নেই, সুন্দর চরিত্রের কোন মূল্যায়ন নেই। সুন্দর চরিত্র তাদের কোন বিবেচনায়ও নেই।

ইবলিস শয়তান ও খান্নাসদের আয়োজিত হাটে মুসলিম ললনাদের পণ্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উঠা উচিত কিনা, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাদের মতলব খুবই খারাপ। এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী মুসলমানদের মধ্যে এ প্রশ্ন নিয়ে প্রবেশ করেছে, অর্থ নিয়ে প্রবেশ করেছে, প্রলোভন নিয়ে প্রবেশ করেছে আর বার বার প্রগতির দোহাই দিচ্ছে মুসলিম নারীদের অধোগতি থেকে উদ্ধারের জন্য। এ জন্য আফসোস

www.nagorikpathagar.org

করছে বার বার। জানেন তাদের পরিচয়? তারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইবলিস গ্রুপের এজেন্ট। এজেন্সিগিরী করা ওদের ব্যবসা। অর্থের বিনিময়ে হেন কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না। নিজেদের স্ত্রীকে, এমনকি ওরা নিজেদের বোন, ভাতিজী-ভাগিনীর সম্ভ্রমকে পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। তারা পারে দেশের নারী-শিশুকে বিদেশে পাচার করতে, তারা পারে নির্মল আবহাওয়াকে কলুষিত করতে, আর পারে নারীর মান-সম্ভ্রমকে বাজারের পণ্যের মত বেচাকেনা করে মানুষের নৈতিক বোধকে বিতাড়ন করতে। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মুসলিম নারী অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা, এ প্রশ্নকে তারা বাহন করে সমাজের মানুষের মনে শয়তান প্রবেশের সুযোগ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা নানাভাবে আগে থেকে কলুষিত হয়েই আছে, তারা এ প্রশ্নকে লুফে নেয়। পাবলিসিটিতে লেগে যায়। সমর্থকদের সংখ্যা বাড়ায়। আমাদের সমাজ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। তাই এই মূল্যবোধের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে শয়তানরা তাদের মূল্যবোধ প্রচার-প্রসারের সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের দেশের সরকারও এই ব্রান্ডের। এ জন্য ওরা তাদের চিন্তাধারা ছড়াবার অবাধ সুযোগ পায়, কর্মসূচি বাস্তবায়নের এত হিম্মত দেখায়।

এ পর্যন্ত সরকার তো কয়েকটি গত হয়েছে। কোন সরকারই হিম্মত করে বলতে পারলো না এবং বর্তমান সরকারও বলতে পারেনি, 'মুসলিম নারীদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। আমাদের দেশের কোন মহিলা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যারা এতদসত্ত্বেও অংশগ্রহণ করবে বা এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন দেশে করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত কোন সরকার এমন হুমকি দেননি। কেন দেননি? প্রত্যেক সরকারেই এমন মানসিকতা সম্পন্ন অনেকেই ছিলেন এবং আছেন। তাছাড়া সরকারের পলিসীও অমৌলবাদী হওয়ার পিলপিলীতে ভীষণভাবে আক্রান্ত। ইসলামী মূল্যবোধের কথা বললে বা এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে এবং বেহায়াপনা ও নগ্ন যৌনতার প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিলে যদি তালেবানপন্থী অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে আমেরিকা, ব্রিটেন নাখোশ হবে। প্রগতিবাদীর তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে। এই ভয়ে সরকার ওদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না।

www.nagorikpathagar.org

সবচেয়ে বড় কথা হলো, অতীতের কোন সরকারের বা বর্তমান সরকারের ইসলামী চরিত্র তো নেই-ই, মুসলিম চরিত্রও নেই। এ জন্য বিশ্ব বদমায়েশদের বাজার বাংলাদেশ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের সাপোর্টে পরোক্ষভাবে হলেও সরকার রয়েছে। সমর্থন সরাসরি না দিলেও বাধা দিচ্ছে না, দেয়ওনি অতীতে।

একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। তাহলে বুঝা যাবে, আমাদের দেশের সরকার এ সম্পর্কে কি ভূমিকা পালন করে এবং কিভাবে করে।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসের কথা। 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রাজধানীর একটা হোটেলে। আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি সেই প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিন্দা জানালেন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর। এক ঢিলে দু'পাখি শিকার। নিন্দাও জানানো হলো, আর ওদিকে আয়োজকরা বিনা বাধায় সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করতে পারলেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিন্দা প্রস্তাব ছিল এই, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি সরকার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এ সব অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পৃক্ত না হওয়ার অনুরোধ রাখছেন। স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক জাহানারা বেগমের সভানেত্রীত্বে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে।

সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কর্মকর্তারা অবশ্যই জানতেন যে, মিস বাংলাদেশ অনুষ্ঠান কখন, কিভাবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে। মিস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের আয়োজকরা কখনো গোপনে চুপিসারে এ অনুষ্ঠান করেননি। আয়োজকরা কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচার করেছে, মিডিয়াগুলোতে প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সুতরাং কেমন করে বলবো যে, সরকার এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতেন না? নিশ্চয়ই সরকার জানতেন, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ও জানতো, বাধা দিলে তখন বাধা দিতে পারতো, কিন্তু দেয়নি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হঠাৎ স্থায়ী

www.nagorikpathagar.org

কমিটির বৈঠক আর নিন্দা প্রস্তাব এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তির কি মানে থাকতে পারে? মানে কিছু থাক আর না থাক, তারা তাই করলেন। পত্রিকায় তখন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখে অনেকে অবাক হয়েছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গ্রাম্য প্রবাদের অনুসরণ কি করেছিলেন যে, চোরকে বলেছিলেন চুরি কর, আর এদিকে গৃহস্থকে সজাগ থাকার কথাও বলেছিলেন? কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে টাইম টেবিল গোলমাল করে রাখা হয়েছিল। যাতে চোর বিনা বাধায় চুরি করতে পারে। চুরি করে চলে যাওয়ার পর কিছু হৈ চৈ করার দরকার ছিল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের।

একটি মাত্র নজির এখানে উল্লেখ করছি। এভাবে আরও নজির রয়েছে সরকারি উদাসীনতার, দেখেও না দেখার। কেন সরকার এমন নজির সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্নের একই উত্তর, অতীত বর্তমান সব একাকার, চরিত্রে আপন খালাতো ভাই বা বোন।

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার যে ইতিহাস, সে ইতিহাসে প্রথম নাম রয়েছে এরিক মরলি নামের এক পুরুষের। তার মাথায়ই প্রথম এসেছিল এ খেয়াল। তিনিই বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার প্রথম আয়োজন করেছিলেন। এরিক মরলি একটানা ১৫টি প্রতিযোগিতা পরিচালনার পর তার অভিজ্ঞতার বিবরণ এভাবে দিয়েছিলেন, 'এসব পিলে চমকানো সুন্দরীরা তাদের একেকটি কর্মকাণ্ড দ্বারা আপনার পিলেও চমকে দিতে পারেন। যিনি বিশ্ব সুন্দরী হন, মাফ করবেন, তিনি বিশ্বের মতই একটা জটিল মাথা ব্যথা তৈরি করে দিতে পারবেন অনায়াসে। এ সুন্দরীরা ভীষণ খেয়ালী।'

প্রথম বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৫১ সালে ব্রিটেনে। সেই বছর ছিল ব্রিটেনে উৎসব বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রণক্লান্ত ব্রিটিশ জাতি ক্লান্তি দূর করার জন্য উৎসব বছর হিসেবে ১৯৫১ সালকে বেছে নেয়। চিন্তা করা হয় উৎসবে নতুন কি কি আইটেম যোগ করা যায়। মিঃ মরলি ছিলেন পতিত চরিত্রের মানুষ। তিনি প্রস্তাব দিলেন জাতীয় উৎসব উদ্যোক্তাদের কাছে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার, পরিকল্পনাও পেশ করলেন। তার দেয়া আইটেম ও প্রস্তাব গৃহীত হলো। সুন্দরী

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতার সেই যে শুরু, আর কোন বিরতি ঘটেনি। চলছে তো চলছে এবং হয়ত চলতেই থাকবে।

মিঃ এরিক মরালি পরিচালিত এ ধরনের অনুষ্ঠান করার পর মিস ইংল্যান্ড, মিস ইনাইটেড কিংডম এবং অন্য কয়েকটি দেশ নিয়ে মিস ইউরোপ পর্যন্ত সুন্দরী নির্বাচন শুরু করলো।

মিঃ মরলি যখন প্রথম এ অনুষ্ঠান শুরু করেন, তখন এই প্রতিযোগিতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। ছিল শুধু ব্রিটেনের উৎসব বছরের আকর্ষণ বৃদ্ধির একটি আইটেম যোগ করা মাত্র। উৎসব কর্তৃপক্ষ মরলির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অনুষ্ঠানের নাম নিয়ে। মরলি নাম দিলেন মিস ওয়ার্ল্ডস কনটেস্ট।

বিলাতের সভ্যতাই নেংটা সভ্যতা। সেই সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে উলঙ্গ করা কোন ব্যাপার নয়। সে দেশের বা সেই মানসিকতার নারীদের আপত্তি থাকার কথা নয়, বরং আগ্রহই থাকে বেশি, পাবলিসিটি পাওয়া যায়, পরিচিতি বাড়ে, জয় এবং পরাজয়, উভয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অনেক অর্থ ও নানা পুরস্কার। নেংটা চরিত্রের নারীরা প্রচণ্ড ভিড় জমায়। মরলি এ ব্যবসায় অনেক সুনাম ও অর্থ উপার্জন করলেন। যৌন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে মরলির জমার ঘর উপচে পড়তে লাগলো। এই সাফল্য আমেরিকার একই মানসিকতার ব্যবসায়ী মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এরপর থেকে আমেরিকায় চালু হয়ে গেল মিস ইউনিভার্স, মিস ইন্টারন্যাশনাল নামের প্রতিযোগিতা, মিস ওয়ার্ল্ড কনটেস্ট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এরিক মরলিই একাই মিস্টার ওয়ার্ল্ড। প্রথম বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হয়েছিলেন সুইডেনের মিকি হাকোমসম। তার স্ট্যাটিসটিক্স ছিল ৩৭-২৩-৩৬। ওজন ১৩১ পাউন্ড, বয়স ২১। এখানে তিনি পুরস্কার ছাড়াও পোজ দিয়ে চেক নেয়ার ছবি তোলার জন্য অতিরিক্ত এক হাজার পাউন্ড পেয়েছিলেন।

এর পর আসে সুন্দরী নির্বাচনের জন্য কি কি দিক বিচার্য, এ প্রশ্ন। প্রথমেই

www.nagorikpathagar.org

কথা উঠলো অন্যদের নয়নের তৃপ্তিদায়ক মুখশ্রী থাকলেই চলবে না, আকর্ষণীয় দেহশ্রীও থাকতে হবে। আর একটা শর্ত জুড়ে দেয়া হলো আর তা হলো এই, বিচারক হবেন পুরুষরা। ১৯৩৬ সালে জ্যামাইকার মারোল ক্রফোর্ড গড় পড়তার বাধন ভেঙ্গে ৩৩-২২-৩৩ স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে জিতে গেলেন। তার উচ্চতা ছিল ৫-৩´। সেখানে গড় পড়তা স্ট্যাটিসটিক্স নির্ধারণ করা হয় লম্বায় কমপক্ষে ৫-৫´, ওজন ১২২ পাউন্ড থেকে ১৩১ পাউন্ড, বুকের মাপ ৩৬ বা ৩৭ ইঞ্চি, কোমর ২২-২৪ এবং নিতম্ব ৩৫-৩৬-এর মধ্যে। অন্যান্য মাপ-জোকের ব্যাপার কহতব্য নয়। এর নাম বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা। সাথে আছে বয়সসীমা। বয়স হবে ১৭-২৫-এর মধ্যে।

নোংরা, ময়লা-আবর্জনা স্বাস্থ্যহানিকর বলে আমরা সকলেই মানি, কিন্তু এই ময়লা অপসারণ করতে হলে অপসারণকারীর দেহে বা জামা-কাপড়ে দু'চার ছিটাফোটা লাগতে পারে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাকে লাগবেই। এ জন্য আলোচনার প্রয়োজনে সেই অঙ্গনের বিধি-ব্যাকরণ আলোচনায় আসবেই। এ জন্য কেউ আমাকে মন্দ বললে আমি নিরুপায়। যাহোক, সৌন্দর্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে পঞ্চাশের দশক থেকে খুবই মাতামাতি শুরু হয়। সুন্দরীরা আরো সুন্দরী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লেগে যায়। কিভাবে মুখের শ্রীকে বেশি বেশি শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, আন্তর্জাতিক মাপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মাপা যায়, এ ব্যস্ততা বেড়ে যায়।

প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহদের অন্দর মহলের মহিলারা কি কি প্রসাধনী ব্যবহার করতেন, তারা খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। এদিকে প্রসাধন ব্যবসায়ীরা ফেসিয়াল ম্যাসেজ, বডি ম্যাসেজ, হাতের জন্য ম্যানিকিউর, পায়ের জন্য প্যাডিকিউর প্রভৃতি প্রসাধনী উৎপাদন করে সুন্দরীদের বিভ্রান্ত করতে থাকে। ১৯৬০ সালে শুধু আমেরিকায় ৫০০ কোটি ডলারের নতুন নতুন প্রসাধনী বিক্রি হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। একই হারে প্রসাধনী বিক্রি হতে থাকে। যারা সুন্দরী হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা যেমন প্রসাধনী ব্যবহার করতে থাকেন আর যারা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা করেন না তারাও

www.nagorikpathagar.org

নিত্যনতুন প্রসাধনী ব্যবহারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুন্দরীর নন্দনতত্ত্ব নিয়ে নানা কথা লেখা হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনীর ব্যবহার রাত-দিন চলতে থাকে।

গোটা বিশ্ব আজ সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর এ ক্ষেত্রে ব্যস্ততা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বাংলাদেশ এরশাদ আমল থেকে এদিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে, তা লক্ষ্য করা যায়। দুই মহিলাকে ক্ষমতায় পেয়ে তারা অস্থির হয়ে উঠে।

বাংলাদেশ কখন থেকে সুন্দরী প্রতিযোগিতার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঝুকে পড়ে, তা আমরা জানি। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ললনার মধ্যে এই পিলপিলি বা চুলকানিসহ এলার্জি কোন্ সন ও কোন্ প্রেক্ষাপটে শুরু হলো, তা বলছি।

পাকিস্তান আমলেই পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক মহিলাদের একটা সংগঠন ছিল। সেই সংগঠন অল পাকিস্তান উইম্যান এসোসিয়েশন নামে পরিচিত ও খ্যাত ছিল। উভয় অংশের বড় বড় শহরে এসোসিয়েশনের শাখা ছিল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও শাখা নেত্রীদের অনেকেই ছিলেন মন্ত্রী ও আমলাদের স্ত্রী। তখন অনেকে তাদের কৌতুক করে বলতেন, 'আপওয়ার আপারা।' এই আপাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি ছিল ব্যাপক। তবে মূল লক্ষ্য ছিল দেশের শিক্ষিত নারীদের মধ্যে অধিকার আদায়ের সচেতনতা সৃষ্টি করা। নিজ নিজ বাসার গন্ডি থেকে তাদের বাইরের মুক্তাঙ্গনে আনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা। বলা বাহুল্য, এই সংগঠনটি তথাকথিত প্রগতির হাওয়া প্রবাহিত করে তাদের দিক থেকে অনেকটা সফল হয়। পর্দা প্রগতির অন্তরায়, এই স্লোগান ছড়িয়ে দেয় দেশের আনাচে-কানাচে। মোটামুটিভাবে একটা তরঙ্গ ও প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় আপওয়ার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংগঠনটি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, বিশেষ করে বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজধানীভিত্তিক অনেক মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে নানা নামে নানা মতলবে। কোন কোনটির অস্তিত্ব এখন নেই আবার কোন কোনটির অস্তিত্ব যেমন আছে, তাদের কার্যক্রমও চলছে জোরেসোরে। এ সব সংগঠনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে মহিলাদের সাংস্কৃতিক

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন। এ সংগঠনগুলোর পিছনে রয়েছে বিদেশী এনজিও। রাজনীতি ও সংস্কৃতি তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাদের রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক, সর্বক্ষণ তারা সক্রিয়। পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার। গ্রামাঞ্চলেও তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। প্রগতির ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টিই তাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য প্রায় অর্জিত বলা যায়। ধর্ম তাদের দৃষ্টিতে প্রগতির অন্তরায়। শরীয়তের বিধি-বিধান বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে, বিলকুল তাদের না পছন্দ। ফতোয়া নিয়ে তারা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছিল এবং হাইকোর্টের এক বিচারককে বশীভূত করে তাদের মতের অনুকূলে রায় পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয়। ভালবাসার নামে যৌনতায়, বিবাহপূর্ব জীবনে যৌনতায় ডুবে যাওয়া তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। ধর্ষণে আপত্তি তবে সম্মতিতে জ্বীনায় দোষ নয়। পতিতাদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। পতিত চরিত্রের পুরুষগুলো আর মহিলাগুলো মিলে যুবতীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দিগম্বর করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পটভূমি এটাই। আপওয়া মহিলা সংগঠন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ-উত্তর এনজিও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নেপথ্যের বিশেষ ভূমিকায় সৃষ্ট নারী সংগঠনগুলো পর্যায়ক্রমে সময়ে সময়ে ও স্তরে স্তরে নানা কর্মকাণ্ড দ্বারা এমন এক প্লাকন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যার ফলে 'জাতীয় পতিতা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

'সুন্দরী প্রতিযোগিতা' স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। পতিত পুরুষরা তো তাদের পিছনে রয়েছে। ধর্মীয় বোধ, অনুভূতি ও নৈতিকতার যে পর্দা আমাদের দেশের নারীদের শীতল ছায়ায় রেখেছিল, পতিত পুরুষদের উস্কানিতে পতিত যুবতীরা সেই ছায়া থেকে বের হয়ে আসে এবং পতিতাদের চেয়েও অধিকতর নগ্ন হয়ে দেহকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে। পতিতারা নিজেদের দেহকে শুধু খদ্দেরদের সামনে দিগম্বর করে প্রয়োজনে, কিন্তু পতিতা চরিত্রের সুন্দরীরা নিজেদের দেহকে দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরে। এদিক দিয়ে পতিতালয়ের পতিতা থেকেও নিম্নমানের চরিত্রের মানুষ হয় বিশ্ব সুন্দরীরা। তাদের পতিতা বললে মান বাড়ে। কারণ, স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে তাদের অবস্থান

www.nagorikpathagar.org

পতিতাদের চেয়েও কয়েক ধাপ নিচে। যা হোক, বাংলাদেশের তথাকথিত সুন্দরীরা তৎকালীন পাকিস্তানের আপওয়া এবং বাংলাদেশের এনজিও পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট মহিলা সংগঠনগুলোর ফসল।

মহিলা সংগঠন বলতেই অপসংস্কৃতির ডিপো বোঝার কোন কারণ নেই। অনেক মহিলা সংগঠনের সামনে রয়েছে মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ। তারা গৃহবাসী নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সেলাই, সূচিকর্মসহ অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সমাজের নারীরা উপকৃত হচ্ছে। এ সব মহিলা সংগঠন দ্বিতীয় ভাগে পড়ে।

বাংলাদেশ আমলের প্রথম সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হয় নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যদিয়ে। খুন, ছিনতাই আর লুটপাট, বাড়ি দখল, গাড়ি দখল, জমি দখল, দোকান আর বাসা দখল, অপহরণ আর নানা অপকর্মের মধ্যদিয়ে অরাজকতার রাজত্ব চলছিল সে সময়টাতে। এ সময়েই এল মহা দুর্ভিক্ষ। লাখ লাখ মানুষ মরলো। দুর্ভিক্ষ ছিল অন্নের, বস্ত্রের, মান-ইজ্জত-সম্ভ্রমের, দুর্ভিক্ষ ছিল স্বাস্থ্যসেবার এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের। এই দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ ছিল না শুধু দুর্নীতির। সরকারি দল এই দুর্ভিক্ষকে পুঁজি বানিয়ে রাতারাতি বড় লোক বনে যায়। এ সময় গোটা দেশের মানুষের সামনে নৈতিকতা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। খুব কম লোক তাদের নৈতিক চরিত্র বহু কষ্টে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। মানুষ নামের যৌন জীবদের রাজত্ব তখন চলছিল। আইনের কোন শাসন দেশে ছিল না। এই অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দরীরা নিরাপত্তা না থাকার কারণে তাদের রূপ আর সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে প্রদর্শন করতে পারেনি। ঝাপটা বাহিনীর ঝাপটা থেকে নিজেদের দেহকে রক্ষার জন্য সুন্দরীদের দৌরাত্ম্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

১৯৭৫-এর আগস্টে রাজনীতির দৃশ্যপট সম্পূর্ণভাবে ওলট-পালট হয়ে পড়লো। ক্ষমতায় আসলো নতুন সরকার। আইন-শৃঙ্খলার অনেক উন্নতি ঘটলো। অরাজকতার বদনাম দূর হলো। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার অবসান ঘটলো, মানুষ স্বস্তির

www.nagorikpathagar.org

নিঃশ্বাস ফেলে বুক হালকা করার সুযোগ পেল। নতুন সরকার, নতুন বিন্যাস, নতুন মূল্যবোধ।

নারীর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রবেশ : কোন সরকারই পুলিশ বাহিনীতে মহিলা নিয়োগ করেনি বা মহিলা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও মনে করেনি। কিন্তু নতুন সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান পুলিশ বাহিনীতে মহিলা রিক্রুটের প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন এবং রিক্রুটও করলেন। নতুন এক ইতিহাস প্রেসিডেন্ট জিয়া সৃষ্টি করে গেলেন।

বাংলাদেশের সুন্দরীরা দেখলো, এখনই ময়দানে নামার সময়। সরকার নারীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ সময় টেলিভিশনেও বিজ্ঞাপনে মডেল সুন্দরীদের নানা অঙ্গভঙ্গি দেখা যেতে লাগলো। হাস্যেলাস্যে তারা কথার ফুলঝুরি দর্শকদের উপহার দিতে থাকলেন। বিজ্ঞাপনে 'সুন্দরী' শব্দটা আসতে থাকে। অমুক জুয়েলারিতে সুন্দরীদের ভিড়, সুন্দরীরা অমুক সাবান পছন্দ করে, অমুক শাড়ি সুন্দরীরা পরিধান করেন ইত্যাদি কথা সুন্দরী-সমৃদ্ধ হয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে আসতে থাকে। সুন্দরীরা চেহারা প্রদর্শনের জন্য অস্থির হয়ে পড়লো। পত্রপত্রিকায় সুন্দরী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র ছাপা হতে থাকে। কয়লা সুন্দরীরাও বিশ্ব সুন্দরী হওয়ার জন্য অনুশীলন শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, জিয়াউর রহমান তাদের জিন্দা হওয়ার প্রেরণা দিলেন অলক্ষ্যে। এ সব সুন্দরীর একজন তো এক সাক্ষাতকারে বলেই ফেললেন, উৎসাহটা আমরা সে সময়ই পেলাম। মনে হলো, আর বাধা থাকবে না। আসলে আমরা বন্ধন মুক্তির পথই উন্মুক্ত দেখলাম।

জিয়াউর রহমানের শাসনকালের পর আসে বিচারপতি সাত্তারের শাসনকাল। এরপর যার শাসনকাল এলো, তার শাসনামল ছিল সুন্দরীদের অধিকতর মুক্তভাবে চলার সোনালী আমল। শাসক নিজেও ছিলেন পরনারী রোমান্টিকতায় গদ গদ, আপ্লুত ও নিমজ্জিত। ওরা এ সময়ে নিজেদের গুছিয়ে নেয় ভালভাবে। তবে বাংলাদেশের সুন্দরীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংগঠিত একটা ঘটনায় সে সময় হতাশ হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ১৯৮৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাতে। সেরা সুন্দরীর এক জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক উৎসব

www.nagorikpathagar.org

গ্রেনেড বিস্ফোরণে শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক রূপ পরিগ্রহ করে। সেরা সুন্দরীর মাথায় মুকুট পরানোর সময় জনতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত ৩টি গ্রেনেড বিস্ফোরণে ২০ জন নিহত ও ২৩ জন আহত হয়। বিস্ফোরণে সেরা সুন্দরী আহত হননি। এই গ্রেনেড নিক্ষেপের জন্য সরকার কম্যুনিস্টদের দায়ী করে।

এ ঘটনার পর বাংলাদেশের সুন্দরীরা বেশ ঘাবড়িয়ে যায়। প্রতি বছরই নানা ঘটনা ঘটতে থাকে সুন্দরী প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে। কোন কোনটি তাদের হতাশ করেছে, আবার কোন কোনটি তাদের মনে আশা জাগিয়েছে। তবে স্থানীয় সুন্দরীদের প্রস্তুতি আর অনুশীলন থেমে থাকেনি। ১৯৯৩ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে 'মিস সারায়েভো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনীয় তরুণীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এ ঘটনা বাংলাদেশী সুন্দরীদের খুব অনুপ্রাণিত করে। তারা ভাবলো, বসনিয়ার যুদ্ধ যখন ওদের যাত্রা পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি, আমরা কেন থামছি? বসনিয়ায় এই প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সারায়েভোর ওপর বসনীয় সার্ব বাহিনীর বছরব্যাপী অবরোধ চলছিল এবং শহরে পানি ও বিদ্যুতের অভাব সত্ত্বেও এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে বাংলাদেশের একদল পতিত ও পতিতা মন ও চরিত্রের পুরুষ ও নারী 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে এক সংগঠন তৈরি করে সুন্দরী প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ঘোষণা করেন, ১৯৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করবেন। কিন্তু দেশের প্রকৃত সংস্কৃতিবান এবং পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষেরা খুবই প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠার কারণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

সে দিন 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। কিন্তু তাদের প্রথম পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ করে দেয় দেশের সংস্কৃতিবান জনতা। সরকার কিন্তু কিছুই করলেন না, কিছুই বললেন না। সরকারের উচিত ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্মাতাদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা যে, কি মিয়ারা, একি শুনছি আর দেখছি? এ নাম কেন তোমরা বেছে নিলে? তোমরা কি জান না যে, এই নামের একটি কোম্পানির ষড়যন্ত্রের ও চক্রান্তের জালে আটকা পড়ে ১৭৫৭ সালে

www.nagorikpathagar.org

আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম? এখন তোমরা আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যতটুকু আছে, তা হারাবার জন্য তাদের নামেই কি আত্মপ্রকাশ করেছো? তোমরা যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরাধিকারী, তখন অবশ্যই জান বাংলাদেশে নতুন কাসিমবাজার কুটির আর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত। নিশ্চয়ই চেন, ঘসেটি বেগম আর রায়দুর্লভ, মীর জাফরকে। ১৬৬৪ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তোমাদের হেডকোয়ার্টার কলকাতায়? ঢাকায় যদি হয়ে থাকে, তাহলে ঢাকার কোথায় তোমাদের হেড কোয়ার্টার? ওয়াটসন আর ক্লাইভের ভূমিকায় কোন্ কোন্ গুণধরকে তোমরা রেখেছো? এসব প্রশ্ন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের জর্জরিত করে তাদের মতলবসহ অনেক তথ্য উদঘাটন করতে পারতেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে চিরদিনের জন্য তাদের তৎপরতা বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার এ পথে গেলেন না। সরকার এমনভাবে চুপ থাকলেন, যেন এ ব্যাপারে সরকারের কোন বক্তব্য বা ভূমিকাই নেই।

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে যে প্রতিষ্ঠান তৎপরতা শুরু করেছিল, জনরোষে বন্ধ হয়ে গেল তা আমরা দেখলাম। কিন্তু নাম বদল করে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠলো কিনা তা অনেকেই বুঝতে পারেননি। বুঝার কথাও নয়। কিন্তু সন্দেহ থেকেই গেল।

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেখা যায়, 'টেলিভিশন' নামে একখানা ম্যাগাজিন। সেই ম্যাগাজিনে দেখলাম কয়েকটি ঘোষণা। টেলিভিশন ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে, বিজয়ীনীদের 'মিস জেলা' নামে ঘোষণা করবে ও পুরস্কৃত করবে, যেমন মিস ঢাকা, মিস চট্টগ্রাম, মিস খুলনা, মিস সিলেট ইত্যাদি নামে। এদের নিয়ে তারা করবে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশভিত্তিক সুন্দরী প্রতিযোগিতা। চট্টগ্রাম হবে তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান ভেন্যু। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় তাদের ঘোষণা ছিল এই, 'মাসিক টেলিভিশন' প্রথম বারের মত মিস চট্টগ্রামের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বিটিভির জন্য নতুন প্রতিভা অন্বেষণ যা অন্যভাবে বলা যায়, টিভির জন্য নতুন সুশ্রী মুখ অন্বেষণ।

www.nagorikpathagar.org

এ উদ্যোগ নিতে পারতো বাংলাদেশ টেলিভিশন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ ক্ষেত্রে বিটিভি নিস্পৃহ। ফলে মাসিক টেলিভিশনকে এগিয়ে আসতে হলো। অতএব এ উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বৃহত্তম জেলা শহর চট্টগ্রামকে আমরা বেছে নিয়েছি। পর্যায়ক্রমে দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে জেলা পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়িনী নির্ধারণ করা হবে। প্রতিযোগিতা হবে মিস ঢাকা, মিস রাজশাহী, মিস খুলনা, মিস যশোহর, মিস বগুড়া, মিস ময়মনসিংহ, মিস বরিশাল, মিস সিলেট, মিস কুমিল্লা। এভাবে হবে দেশের বৃহত্তর জেলাগুলোতে। জেলা ও বিভাগ পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সুন্দরীদের মাঝ থেকে পাঠকের ভোটে নির্বাচিত হবে মিস বাংলাদেশ। মেধাসম্পন্ন প্রতিভা বাছাইয়ের জন্য আমাদের ইচ্ছা রয়েছে মিস ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের। সেখানে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা অংশ নিতে পারবেন। প্রাথমিক বাছাইয়ে যারা উত্তীর্ণ হবেন, আমাদের নিজস্ব আলোকচিত্রী তাদের ছবি তুলবেন। মাসিক টেলিভিশনের নিজস্ব আলোকচিত্রীর তোলা ছবির ভিত্তিতে টেলিভিশন সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত বোর্ডই বিজয়িনী নির্ধারণ করবেন। এ ক্ষেত্রে এই বোর্ডের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।'

টেলিভিশন ম্যাগাজিনে এই সিদ্ধান্ত পাঠের পর প্রথমে আমার সংশয় সৃষ্টি হলো। টেলিভিশন ম্যাগাজিন কি বিটিভির? পরে জানতে পারলাম, টেলিভিশন ম্যাগাজিনের সাথে বিটিভির কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। আবার প্রশ্ন সৃষ্টি হলো, তাহলে বিটিভির নাম ভাঙ্গিয়ে এই ম্যাগাজিন কেন এ খেলায় মত্ত হলো? বিটিভি কর্তৃপক্ষ কেন বাধা দিচ্ছে না? ভাবলাম, হয়তো নীরব সমর্থন থাকতেও পারে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতার এটাই ছিল দ্বিতীয় উদ্যোগ। তারা সেই উদ্যোগ গ্রহণ করে অনেকটা লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হন। এদিকে বিটিভিও ১৯৯৩ সালের ঈদের আনন্দময় প্রোগ্রামে সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে 'প্রিয়দর্শিনী' প্রতিযোগিতা শুরু করে।

১৯৯৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। বিজ্ঞাপনের বাংলা শিরোনাম ছিল 'বাঙ্গালী বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা' ১৯৯৪। ইংরেজিতে শিরোনাম ছিল Miss Bengali 1994 ২৮শে আগস্ট, ১৯৯৪ লন্ডনের ওয়েম্বলী কনফারেন্স সেন্টারে একটি আন্তর্জাতিক বিচারক মণ্ডলী নির্বাচন করেন মিস বেঙ্গলী ১৯৯৪। এই বিজ্ঞাপনে আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল ১৫ই মার্চ (১৯৯৪), লন্ডনের ঠিকানাও দেয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনে। অনুরূপ বিজ্ঞাপন ভারতের পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হয়। যথা সময়ে 'মিস বেঙ্গলী ১৯৯৪' অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে বিশ্ব সুন্দরীদের যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও বাংলাদেশ বেসরকারিভাবে অংশগ্রহণ করে ১৯৯৪ সালে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের যে তরুণী অংশগ্রহণ করেন, তার নাম অনিকা তাহের, চট্টগ্রামের মেয়ে।

১৭ই নভেম্বর (১৯৯৪) ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতায় মিস অনিকা পিয়ানো বাজিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন। ৮৭টি দেশের মধ্যে প্রতিযোগীদের মধ্যে অনিকা ১৪ নম্বর স্থান অধিকার করেন। মিস অনিকা বলেন, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী না হলেও এই প্রথম আমি বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে একটি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় হাজির হয়েছি, এ গৌরব আমার জন্য কম নয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে ১৯শে নভেম্বর (১৯৯৪) মিস ওয়ার্ল্ড ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে বিভিন্ন দেশের সুন্দরীদের দেহ এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিচারক আর পরীক্ষকরা যা করেন, তা বর্ণনা করার মত নয়। কত যে জঘন্য হতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। এ সব খবরাখবর জানার পর ইন্দোনেশিয়ার মেয়েরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা আর কখনো সুন্দরী প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্সে অংশ নেবে না। কারণ, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে অশ্লীল পোশাক পরতে হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ প্রদর্শন করতে হয় পুরুষ বিচারক ও পরীক্ষকদের সামনে। ইসলাম এ সবের বিরোধী। মহিলা বিষয়কমন্ত্রী মিয়েন সুগান্ধি বলেছেন, মূলত এ সব অশ্লীল কারণেই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আর কখনই মেয়েদের পাঠানো হবে না। বার্তা সংস্থা আনতারা ৯ই আগস্ট ১৯৯৪ সালে এ খবর পরিবেশন করেছিল। জুলাই '৯৪-তে ১৯৯৪ মিস

www.nagorikpathagar.org

ইউনিভার্সের ইন্দোনেশিয়া সফরকে কেন্দ্র করে সুগান্ধি (মন্ত্রী) উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। ভারতের সর্বপ্রথম ইউনিভার্স সুন্দরী সুমিতা সেন ইন্দোনেশিয়ায় ৫ দিনের সফরকালে তৎকালীন ফার্স্টলেডি তিয়েন সুহার্তো এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ সরকারিভাবে যদিও বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু বেসরকারিভাবে যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তা যে সরকারের সমর্থনে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং বেসরকারি অংশগ্রহণ যে সরকারি অনুমোদনে, তা নিশ্চিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রতি বছরই বাংলাদেশের অসুন্দর চরিত্রের মেয়েরা অসুন্দর চরিত্রহীনদের মেলায় যাচ্ছে আর বাংলাদেশের জন্য আল্লাহর গজব ডেকে আনছে।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দেশে সুন্দরভাবে, নির্বিঘ্নে এবং হাঙ্গামা ছাড়া যে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তা বলা যায় না। কোথাও প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছে, প্রতিবাদকারীরা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে, অনুষ্ঠানস্থলে বোমা ফেটেছে, ভারতে প্রতিবাদকারী এক যুবক একবার এই অশ্লীল অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানা দেশে নানা অনুষ্ঠানস্থলে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে, নাইজেরিয়ার ঘটনা এ পর্যন্ত সর্বশেষ প্রমাণ। কিন্তু বিশ্বের তাবৎ বদমায়েশ পুরুষ আর নারীরা এবং এই মানসিকতা সম্পন্ন বিভিন্ন দেশের সরকার বছর বছর এ অনুষ্ঠান করেই যাচ্ছেন। তাদের কথা হলো, বাধা আসবে, আসুক। আমাদের যাত্রা থামবে না। বাস্তবে তাদের যাত্রা থামছেও না, ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। এর মানে ওরা ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠছে।

মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মালয়েশিয়ার 'দ্য স্টার'। সেই পত্রিকায় কলাম লেখেন মারিনা মাহাথির (৪৬)। তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের কন্যা। মারিনা মাহাথির লেখাপড়া করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি একাডেমিক লেখাপড়াই শুধু করেননি, লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি নিজের চিন্তাধারা প্রচুর 'সংশোধন' করেন। তার এই 'সংশোধিত' চিন্তাধারা নিয়মিত

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ পায় ইংরেজি সেই দৈনিকে। মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়ে তিনি 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা'র কট্টর সমর্থক। তার জীবনধারা ইসলামের ঠিক বিপরীত। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরের কোন এক সংখ্যার দ্য স্টার পত্রিকায় তার অভিমত প্রকাশ পায়। তিনি সুন্দরী প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করেন। মুসলিম নারীদের ওপর ইসলামের কোন বিধি নিষেধ আরোপ হোক তা তিনি চান না। তার মতে, মুসলিম মেয়েরা মাথায় কাপড় দিল কিনা, স্কার্ট পরলো না শার্ট, না স্লিভ লেস কিছু পরলো তাতে কি আসে যায়। মেয়েরা সুইমিংপুলে সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতার কাটলে সেখানেও কি নজরদারির জন্য কোন পুরুষকে রাখা হবে, সে কিনা সুইমিং কস্টিউম পরার জন্য মেয়েদের ভর্ৎসনা করবে? সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইসলাম সমর্থন করে না, এ তিনি মানতে চান না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এই, তিনি যার কন্যাই হোন না কেন, যত উচ্চাসনে তার অবস্থান হোক না কেন, ইসলাম সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। মনে হয় ইসলামের তালিম তিনি কখনো পাননি। যদি নারীর সম্ভ্রম-ইজ্জত সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকতো, তাহলে যেভাবে সুন্দরীরা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দেয় নগ্ন হয়ে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ দেয়, তা তিনি সমর্থন করতেন না। আল্লাহ না করুন, যদি তার মান-সম্ভ্রম কেউ লুট করে নেয়, তাহলেও কি তিনি বলবেন, 'তাতে কি হয়েছে?'

এসব মুসলিম মহিলা 'সুন্দরী' প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা ছিল, সোচ্চার হওয়া তো দূরের কথা, এই বেহায়াপনার সমর্থনে বরং তারা এগিয়ে আসেন। কোন কোন মুসলিম দেশের এক শ্রেণীর মহিলার যদি এই ভূমিকা হয়, তাহলে এই বেহায়াপনা থেকে নিস্তার পাওয়া কি সম্ভব? এ সব মহিলা ও পুরুষের আশ্কারা পাওয়ার কারণেই বাংলাদেশের মত একটা দেশ এই বেহায়াপনায় ডুবে যাচ্ছে এবং ডুবতে ডুবতে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। লাশ হয়ে কখন ভাসবে, তা শুধু দেখার বাকি আছে।

আশ্কারা, প্রশ্রয়, সুযোগ আর সরকারের প্রচ্ছন্ন সম্মতি পেয়ে বাংলাদেশে সুন্দরী সংস্কৃতিপন্থীরা কোন্ পর্যায়ে নেমেছে, 'মিস রূপসী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার

www.nagorikpathagar.org

আয়োজন প্রস্তুতির বিভিন্ন দৃশ্যই তা প্রমাণ করে। ১৯৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার একটি হোটেলে রূপসী বাংলাদেশ-এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জনক্ষোভ ও জনরোষ এতই প্রচণ্ড ছিল যে, অবশেষে সরকারই এই প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু এর আগে দেশের ছয়টি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বিভাগীয় প্রতিযোগিতা।

১৬ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় মিস রূপসী বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগিতা 'মিস রূপসী চট্টগ্রাম'। প্রাথমিক নির্বাচনে অংশ নেন মোট ২৮ জন প্রতিযোগী। ওদের থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগীরা চট্টগ্রাম ক্লাবের সুইমিংপুলের সাইডে কয়েকশ' দর্শকের সামনে ক্যাটওয়ার্ক করেন। বিচারকদের রায়ে চট্টগ্রামের মেয়ে আফরোজা বেগম 'মিস রূপসী চট্টগ্রাম' নির্বাচিত হন। সুন্দর ও স্নিগ্ধ হাসির জন্য 'মিস সুস্মিতা' নির্বাচিত হন নোয়াখালীর ক্রিস্টেল মেন্ডা কুইয়া এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য চট্টগ্রামের মেয়ে নূর জাহান রোজী নির্বাচিত হন 'মিস পার্সোনালিটি।' পীর-আউলিয়ার চট্টগ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হলো এই প্রতিযোগিতা।

২৪শে ফেব্রুয়ারি হলো 'মিস রূপসী রাজশাহী।' বগুড়ার নট্টামস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল 'মিস রূপসী রাজশাহী।' এতে প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৭ জন। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন ১৫ জন। বিচারকদের রায়ে 'মিস রূপসী রাজশাহী' নির্বাচিত হন দিনাজপুরের মেয়ে রাবেয়া বেগম। 'মিস সুস্মিতা' নির্বাচিত হন রাজশাহীর মনিসা পারভীন প্রীতি এবং 'মিস পার্সোনালিটি' নির্বাচিত হন রাজশাহীর মেয়ে রোকসানা আখতার রিনি।

২রা মার্চ (১৯৯৮) বরিশাল শহরের বিডিএম মিলনায়তনে সুন্দরী প্রতিযোগিতার ৩য় পর্ব 'মিস রূপসী বরিশাল' অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল বিভাগে 'মিস রূপসী বরিশাল' নির্বাচিত হন বরিশালের মেয়ে নাজিয়া হাসান রুপু। 'মিস সুস্মিতা' নির্বাচিত হন নাফিসা আক্তার এবং 'মিস পার্সোনালিটি' নির্বাচিত হন সুরভী।

www.nagorikpathagar.org

৬ই মার্চ সিলেট গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় 'মিস রূপসী সিলেট।' বিচারকদের রায়ে 'মিস রূপসী সিলেট' নির্বাচিত হন সাবিনা ওয়ারী। 'মিস সুস্মিতা' নির্বাচিত হন সলিমা খন্দকার। আর 'মিস পার্সোনলিটি' নির্বাচিত হন ডালিয়া সরোওয়ার। হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর পূণ্য স্মৃতি ধন্য সিলেটে এই নগ্ন বেহায়াপনার অনুষ্ঠান হয়ে গেলো।

১৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর পান্ডা গার্ডেনে তিব্বত 'মিস রূপসী ঢাকা।' এ ছিল প্রতিযোগিতার পঞ্চম পর্ব। তিব্বত কোম্পানি এই অনুষ্ঠান স্পন্সর করার কারণে এই পর্বের নাম ছিল 'তিব্বত মিস রূপসী ঢাকা।' 'মিস ঢাকা' নির্বাচিত হন সায়লা মিমি। 'মিস সুস্মিতা' হন জিনিয়া মির্জা এবং 'মিস পার্সোনালিটি' নির্বাচিত হন ফৌজিয়া আফরিন।

১৮ই মার্চ ১৯৯৮ তারিখে 'তিব্বত মিস রূপসী খুলনা' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'মিস রূপসী বাংলাদেশের শেষ পর্ব খুলনার উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক নির্বাচনে অংশ নেন ২২ জন প্রতিযোগি। এদের মধ্য থেকে ১০ জনকে নিয়ে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই দশ জনের মধ্যে 'মিস খুলনা', 'মিস সুস্মিতা' ও 'মিস পার্সোনালিটি' নির্বাচিত হন তিন জন। উল্লেখ্য, বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের নির্বাচন বাংলাদেশে এটাই ছিল প্রথম।

প্রথম 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৯৪ সালে লন্ডনের কভেন্ট গার্ডেনে। এই প্রতিযোগিতায় 'মিস বেঙ্গলী' ও 'মিস বাংলাদেশ'-৯৪ দু'জনকে নির্বাচন করা হয়। 'লিংক প্রমোশন' সে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সহস্রাধিক বাঙালি সুন্দরী আবেদন করেছিল। লন্ডনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় 'মিস বেঙ্গলী'-৯৪ নির্বাচিত হন ম্যানচেস্টারের সঞ্জিতা ইসলাম এবং 'মিস বাংলাদেশ'-৯৪ নির্বাচিত হন চট্টগ্রামের তাহের। 'মিস বাংলাদেশ-৯৫' অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। ১২ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে ঢাকায় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা। 'মিস বাংলাদেশ' নির্বাচিত হন বিলকিস ইয়াসমীন সাথী। পিতা এম রেজা এবং মাতা মিসেস ইয়াসমীন। মুসলিম লীগের বিশিষ্ট রাজনীতিক এমএ মতিন তার নানা।

www.nagorikpathagar.org

'সুন্দরী প্রতিযোগিতা আমাদের কন্যাদের হত্যা করছে' এই শিরোনামে ৭ই অক্টোবর ২০০০ সালে দৈনিক সংবাদে জনৈকা শামী পারভিনের একটি লেখা ছাপা হয়। সে লেখাটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন :

পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও প্রতিদিন সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে। এমন কি কখনো শহরেও (দু'দিন পর থানা পর্যায়ে শুরু হতে পারে)। যুগটা মিডিয়ার। তাই তাদের খবর নানাভাবে প্রচারিত হয়। পত্রিকায় ছাপা হয় সুন্দরীদের ঝকঝকে উজ্জ্বল ছবি। মিস টোকিও, মিস আমেরিকা, মিস ঢাকা, মিস বাংলাদেশ, মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স, মিস লাক্স ফটোজেনিক ইত্যাদি পত্রিকায় যে পরিমাণ কভারেজ পায়, তা দেশের প্রধানমন্ত্রী (বিদেশের কোন প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট) ছাড়া অন্য লোক কমই পায়। (এর কারণ মিডিয়াগুলোর সবই এই মানসিকতা সম্পন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত)। মাঝ রাত অবধি বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচুর বিজ্ঞাপন আর নাচ-গানে মাতোয়ারা এ সকল অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রতিযোগীনীসহ এ অনুষ্ঠানের তাবৎ নারী পারফরমাররা প্রায় নগ্ন দেহে এ সকল অনুষ্ঠানে হাজির হয়।

পৃথিবীতে যে সকল নারী এভাবে নিজেদের উপস্থাপন করে ভোগের সামগ্রী হিসেবে, এমন উপস্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে। (কিন্তু ওদের যাত্রা প্রতিহত করা যাচ্ছে না)। তারা বলছে, বাজার অর্থনীতির মুনাফার জন্য এ সকল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তৃতীয় বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করার জন্য তৃতীয় বিশ্ব থেকে বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচন করছে। উদাহরণ স্বরূপ গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নারীদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। (এই প্রাধান্য দেয়াটা পরিকল্পিত)। ভারতকে মডেল বানিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সুন্দরীদের এ লাইনে টেনে আনতে যাচ্ছে। এ দিক দিয়ে পরিকল্পনাকারীরা সফলও বলা যায়। সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর এ সকল সুন্দরী তাদের পণ্যের মডেল করে পণ্যের কাটতি বাড়াচ্ছে। কোন কোন পণ্যের নামেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। যেমন মিস লাক্স ফটোজেনিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এ সব নারীকে ঘিরে তৈরি করা হয় এক স্বপ্নের জগত। এরা কি করে, কি খায়, কখন

www.nagorikpathagar.org

ঘুমায়, কোন্ পোশাক পছন্দ, কোথায় কি করল, এসব খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে এ সকল নারী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ইল্যুশন বা মোহ তৈরি হয়। এরা যখন বিভিন্ন পণ্যের মডেল হয়, তখন পণ্যের বিক্রি বেড়ে যায়। (নোংরা মনের লোকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে)। আয়োজকরা একে সুন্দরীদের আইকিউ টেস্টের নমুনা বলে দাবি করেন। কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে শরীর এবং এই শরীরের নানা ভাবে শরীরী উপস্থাপনা। এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারীর সৌন্দর্য মাপার জন্য কয়েকটি সূচক থাকে। যেমন কতটুকু লম্বা, বুক ও কোমরের মাপ কতটুকু ইত্যাদি (আরও আছে কতিপয় বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মাপ) এ জন্য নগ্ন হতে হয়। নগ্ন হওয়া ছাড়া মাপ দেয়া যায় না। পুরুষরা মহিলার মাপ নেন)। পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর মধ্যে একজনকে সকলের চেয়ে সুন্দরী ভাবা একটি অবৈজ্ঞানিক চিন্তা (যাকে বিশ্ব সুন্দরী ঘোষণা করা হলো তার চেয়ে সুন্দরী নারী বিশ্বে কোটি কোটি রয়েছে, যারা এই বেহায়াপনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি)।

টেলিভিশনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে নারীকে কেবলই শরীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং তাবৎ নারীকুলকে পুরুষের মন জয় করতে কিভাবে আরও মোহনীয়, আকর্ষণীয় ও ফরসা করা যায়, চুল আরও সুন্দর করা যায়, এসব উপায় বাতলে দেয়া হয়, উপকরণ তৈরি করা হয়। আমাদের কন্যাদের ওপর এ প্রতিযোগিতার প্রভাব বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, এ প্রতিযোগিতা এবং মিডিয়াতে এর অনুকরণ আমাদের কন্যাদের স্রেফ হত্যা করছে। গ্লামার জগতের ঝলমলানি আমাদের মেয়েদের চেতনাগতভাবেও হত্যা করছে।

আধুনিক ও পাশ্চাত্য ঘেষা (মুসলিম) পরিবারে মেয়ের রূপ পালিশ করার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করা হয়, এই মেয়েদের বুদ্ধি ও চরিত্র পালিশ করার জন্য সে পরিমাণ চেষ্টা করা হয় না।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা আমাদের মেয়েদের হত্যা করছে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হওয়ার বদলে ওরা পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গড়ে

www.nagorikpathagar.org

উঠছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ না হলে আমাদের নারীদের বাঁচানো যাবে না। এ কাজটা অবশ্যই সরকারকে করতে হবে।

ফরিদা আখতার নারী নেত্রীর 'ল্যাংগুট পরা নারী ও লম্পট পুরুষতন্ত্র' শিরোনামে ১৯৯৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তার একটি লেখা দৈনিক মানবজমিন-এ ছাপা হয়। তিনি সুন্দরী প্রতিযোগিতাকে মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন তার সেই নিবন্ধে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ করেননি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই দৃষ্টিকোণ রাখে না, পোষণও করেন না। এতদসত্ত্বেও তার মানসিক ও নৈতিক বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা আর 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা' এক জিনিস নয়। রুচিবোধের দিক থেকে খুব ভোতা না হলে এ কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এই যুগে অন্যায় নয়। সৌন্দর্য যদি ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে, তখন তার ধর্ম হয় বৈচিত্রের সমাহার। মেপে-ঝুকে একাট্টা একই রকম জিনিস এক দঙ্গলে হাজির করার মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় না। এটা বড় জোর মুনাফাখোরের কারখানার পণ্য উৎপাদন হতে পারে। সুন্দরী হিসাবে সব মেয়েকে একইভাবে ল্যাংগুট পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ভাবলেই বিষয়টি বোঝা যাবে কত বিশ্রী! বৈচিত্রকে লালন আর সমীহ করে না চললে ব্যক্তির সৌন্দর্য কখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার নিজস্বতা, ভিন্নতা ও আলাদা নান্দনিক সাংস্কৃতি বোধ ও উপলব্ধির সাথে জড়িত। নারী হোক বা পুরুষ হোক, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভেদে সৌন্দর্যের ধারায় পার্থক্য হতে পারে। নানা সমাজে এবং সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও সৌন্দর্যের ধারণা নিয়ে পার্থক্য থাকে, সেটাও স্বাভাবিক। এগুলো ভিন্ন বিতর্ক। কিন্তু 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা'র সাথে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ বা ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনই সম্পর্ক নেই। নারীদের যারা বাজারের পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে অভ্যস্ত নয়, কেবল তারাই 'সুন্দরী প্রতিযোগিতায়' নারীর ব্যক্তি অধিকার আবিষ্কার আর ব্যক্তিত্ব দর্শন করে নারী দেহের ব্যবসায়ীদের পক্ষে তত্ত্ব খাড়া করেন।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিছকই একটা বেচাকেনার ব্যাপার। এটা ব্যবসা। বিশ্ব জুড়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নারীর সৌন্দর্য মেপে-ঝুকে দরদাম করে ঘোষণা দেন, ইনি হচ্ছেন বিশ্ব সুন্দরী। যাকে বিশ্ব সুন্দরী করা হলো তাকে বিরাট অংকের অর্থ দেয়া হলো এবং তাকে নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করা হলো। সবাইকে দেখানো হলো, ইনি হচ্ছেন সারা বিশ্বের সুন্দরী। বলা বাহুল্য, যারা এই হিসাব কষছেন এবং সুন্দরীদের নিয়ে বিশ্ব মাৎ করে দিচ্ছেন, তারা নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা বা নারী অধিকারের কর্মীও নন, তারা পয়সাকড়ি হিসাব করে মুনাফা গোনার ব্যবসায়ী। শুধু তাই নয়, এরা সকলেই পুরুষ। তাদের দৃষ্টিতে কোন নারীকে সুন্দরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই, বরং নারী যে পুরুষের ভোগ্য বস্তু, সে কথাটাই তারা ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেন।

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নারীর শরীরে যখন বিশ্ব সুন্দরী বা কোন দেশের সেরা সুন্দরীর বিরাট লেবেল সেঁটে দেয়া হয়, তখন তার শরীরে কাপড় থাকে সবচেয়ে কম। তার দেহ কাপড়ের উর্ধ্বে উঠে যায়। অর্থাৎ নারীকে নেহায়েত একটি শরীর ছাড়া যারা আর কিছু ভাবতে পারে না, তাদের কাছে আমরা নারীর মর্যাদা কেমন করে আশা করতে পারি?

বর্তমান বিশ্বকে অনেকে খুব আধুনিক মনে করেন। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে যা ঘটে তাই যেন আধুনিক, এমন ভ্রান্ত ধারণাও আমাদের অনেকের মধ্যে আছে এবং এই ধাক্কা বিশেষভাবে আছে আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, ঔপনিবেশিক গোলামীর অভ্যাস যাদের এখনো যায়নি। পশ্চিমা দেশের বর্ণনা যদি করতে হয়, তাহলে এই সমাজ এখন প্রধানত কনজুমার সোসাইটি হিসাবে চিহ্নিত। এখানে সব কিছুই ভোগ্য পণ্য, এমনকি মানুষও। নারী তো বটেই। পশ্চিমা দেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতা কোন 'আধুনিকতা' বা সংস্কার মুক্তির তাগিদ থেকে আসেনি। 'ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির মুনাফা অর্জনের আর একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবেই এসেছে। নারী নানাভাবে ভোগের পণ্য। তাকে

www.nagorikpathagar.org

'সুন্দরী' আখ্যা দিয়ে বাজারে ছাড়াটাও ভিন্ন কিছু নয়। এটা আমরা সবাই জানি, সুন্দরী প্রতিযোগিতার সাথে আরো অনেক ধরনের ব্যবসা যুক্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশে যখন সুন্দরী প্রতিযোগিতার সময় ঘোষণা করা হলো, তখন নারী সংগঠনগুলোর পক্ষে বা এর বিপক্ষে কিছুই বলেনি। কেন বলেনি? তারা কি জানে না যে, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী নারীদের গার্জেন পুরুষরা হয়ে যায়, তা কি তারা জানেন না বা জানতেন না?

সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেমে নেই। বাংলাদেশে লাক্স আনন্দধারা ফটো সুন্দরী নির্বাচন হয়ে গেল ২০০২ সালে। নাইজেরিয়ায় বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড দাঙ্গা বাধে। শতাধিক হয় নিহত এবং পাঁচ শতাধিক হয় আহত। সেখানকার 'দিস ডে' নামক একটি দৈনিকে নবী করিম (সাঃ)-এর ওপর কটাক্ষ করে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এই নিবন্ধকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। ফলে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার আসর নাইজেরিয়ার আবু জা থেকে লন্ডনে স্থানান্তর করা হয়। লন্ডনেই এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তুর্কী তরুণী আজরা সাকিন ২০০২ সালের বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচিত হন।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইসলাম সমর্থন তো করেই না, বরং এ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে। কুৎসিৎ হওয়ার কারণে যেমন দুঃখ বোধ করার কোন কারণ নেই, সুন্দর বা সুন্দরী হওয়ার জন্য সৃষ্ট জীবের কোন বড়াই নেই। কুৎসিৎ আর সুন্দর হওয়ার ব্যাপারটা যদি বান্দাহর হাতে থাকতো, তাহলে সবাই সুন্দরই হতো। নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার প্রথম দায়িত্ব নারীর। নারী সৌন্দর্য পণ্য নয়, বেচাকেনার বস্তু নয়, প্রদর্শনীর জন্য এ সৌন্দর্য নয়।

আল্লাহ বলছেন, ('হে নবী) মুমিন পুরুষকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন। মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে ও স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য বাদে যা আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। -সূরা নূর।

'হে নবী আপন বিবি, কন্যা ও মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত রাখে। (সূরা-আহযাব)

'পর পুরুষের সামনে সাজ সজ্জা সহকারে বিচরণকারী নারী আলোবিহীন কিয়ামতের আঁধারের ন্যায়। (তিরমিযী)।

ঈমানের কণা মাত্র যার অন্তরে আছে, সে বিশ্বাস করে পবিত্র কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম যা নাজিল হয়েছে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর, সে তো সুন্দরী প্রতিযোগিতা কখনো সমর্থন করতে পারে না। অনেক অমুসলিম এই নারী সৌন্দর্যের নগ্ন প্রদর্শনীর বিরোধিতা করে, সেখানে মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর মুসলমান কিভাবে সুন্দরী প্রতিযোগিতা সমর্থন করতে পারে?

'আমি সুন্দর' এ নয় আমার অহংকার। আল্লাহ আমাকে সুন্দর অবয়বে ও রূপে সৃষ্টি করেছেন, তার শুকরিয়া আমি আদায় করি কৃতজ্ঞতার সেজদায়। যদি তাতে আমার অহংকার বোধ হয়, তাহলে আমি এই অংকার আঘাতহানী 'আল হামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করে। সকল অহংকার আর প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এই হোক সকল সুন্দরী, বিশেষ করে মুসলিম সুন্দরীদের অন্তরের কথা।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা নববর্ষ বরণ

[যে বাংলা সন আমরা চার শতাধিক বছর থেকে মেনে আসছি, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ক্ষেতে-খামারে কাজ করি, ফসল লাগাই, ফসল তুলি, বছরের রুটিন তৈরি করি, সালতামামি অনুষ্ঠান করি, তেজারতে সারা বছর কি আয়-ব্যয় হলো তা হিসাব করে দেখি, নতুন খাতা খুলি, এই সনের নির্মাতা মুসলমান, প্রবর্তনকারী মুসলমান। অথচ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই, এই সনের 'বরণ' অনুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন, প্রদর্শনী এবং আমোদ-প্রমোদের অধিকাংশই ভিন জাতির সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই সনের উদযাপন অনুষ্ঠানের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত কোথাও আপনি মুসলিম কৃষ্টির কোন কিছু পাবেন না, না আমোদে, না মিছিলে, না সাজসজ্জায়, না আলোচনা সভায় কারো বক্তৃতায়। আপনি যদি ভিন দেশী হন, বাংলা সনের ইতিহাস না জানেন, তাহলে মনে করবেন, অমুসলিমদের কোন অনুষ্ঠান চলছে, সে অনুষ্ঠান মুসলমানের নয়, এর সাথে মুসলমানদের কোন সম্পৃক্ততা নেই।]

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান তিনটি হয়। একটি বাংলা নববর্ষ, অপরটি ইংরেজি নববর্ষ আর তৃতীয়টি হিজরী বা আরবী নববর্ষ। হিজরী নববর্ষ ক্রমিক নম্বরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশে, উদযাপন আর আয়োজনের গরীবী অবস্থা অনুযায়ী।

পহেলা মহররম বাংলাদেশে উদযাপন করা হয় বটে, কিন্তু এ সংক্রান্ত খবর কোন দৈনিকে নামকাওয়াস্তে ছাপা হয়। তবে হিজরী নববর্ষের ওপর দু'চারটা নিবন্ধ ছাপা হয় বটে কোন কোন কাগজে। ধর্মীয় মন যাদের এবং যাদের নফল এবাদতের পবিত্র মনও আছে, এবাদতের অভ্যাসও আছে, তারা আশুরাকে সামনে রেখে মহররমকে ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে বরণ করেন, নফল রোজা রাখেন, কারবালার ঘটনাসহ আশুরা তারিখে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিহাস স্মরণ করেন। শুধু শিয়া মতবাদের একটা শ্রেণী ছাড়া আর কেউ মহররমের, বিশেষ করে কারবালা ঘটনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করেন না। আমাদের দেশের বিভিন্ন মসজিদে আশুরা উপলক্ষে আশুরার ওপর আলোচনা হয় এই দিনটিতে। হিজরী নববর্ষের প্রথম দিন বা প্রথম মাস বা মাসের দশ দিন এভাবেই বরণ করা হয়। পত্র-পত্রিকায় তাজিয়া মিছিলের ছবি ও খবর অবশ্য ছাপা হয়। কোন কোন দৈনিক বা সাপ্তাহিক কর্তৃপক্ষ মহররম, আশুরা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে জাঁকজমকপূর্ণ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় দু'টি, একটি বাংলা নববর্ষ, অন্যটি ইংরেজি নববর্ষ। উদযাপনের জাকজমকতা এবং বরণের বিচিত্র আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে বাংলা নববর্ষ প্রথম, দ্বিতীয় স্থানে ইংরেজি নববর্ষ, মাত্র এক রাতের জন্য, যাকে আমরা বলি ডিসেম্বরের 'থার্টি ফার্স্ট নাইট'। এখানে লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, ইংরেজি নববর্ষের পহেলা দিনের আগের রাত অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ দিনের পর যে রাতকে 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' নামে উদযাপন করা হয়, সেভাবে ১লা বৈশাখের আগের দিনের চৈত্রের শেষ দিনের পর রাতকে 'শেষ চৈত্র' নামে উদযাপন করা হয় না।

বাংলা বর্ষের একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস দীর্ঘ ইতিহাস। এই

www.nagorikpathagar.org

উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় অনেক সনের প্রচলন ছিল বিভিন্ন নামে। বাংলা সন-এর প্রবর্তন হয় মোগল সম্রাট আকবরের সময়। ফসলী সন হিসাবে এর প্রবর্তন।

পবিত্র কুরআনে বর্ষ গণনায় বারো মাসের হিসাব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে গণনায় বারো মাস (সূরা তওবা : আয়াত ৩৬)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বারো মাস ছিল। বিভিন্ন সময় নানা ধরনের বর্ষপঞ্জির উদ্ভব ঘটেছে বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মারক হিসাবে এবং সংসার জীবন যাপনের প্রয়োজনে, সমাজ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের নানা তাগিদে। অনেক বর্ষপঞ্জির উদ্ভব ঘটেছে, অনেক বিলুপ্ত হয়েছে, এ সবের কোন কোন কাহিনী ইতিহাসে আছে আবার অনেক বর্ষপঞ্জির কাহিনী ইতিহাসে স্থান পায়নি। বাংলা সন যা বাংলা ভাষাভাষী দেশে বা অঞ্চলে এখন প্রচলিত, তার জন্ম হয় হিজরী সনের গর্ভ থেকে। বাংলা সনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে এই : মক্কা থেকে মদীনায় আল্লাহর হাবিব (সাঃ) হিজরত করেন। তার ওফাতের পর হযরত উমর (রাঃ) হিজরত বছরের মহররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন। সেই বর্ষপঞ্জিই হিজরী সন। বাংলাদেশে হিজরী সন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত হয় ৫৯৮ হিজরী সনে মোতাবেক ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে। তখন থেকে গোটা সুলতানী আমল এবং মোগল আমলে এই সনই ছিল রাষ্ট্রীয় সন। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে রাজস্ব আদায়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। আকবরের রাজ্যও ছিল অনেক বিস্তৃত। ফসল তোলা ও রাজস্ব আদায়ে প্রচলিত বর্ষ পঞ্জিকা সমস্যা সৃষ্টি করে। বাদশাহ আকবরের কাছে সমস্যাটি তোলে ধরা হয়। তখন তিনি সকলের সুবিধা অনুযায়ী একটি বর্ষপঞ্জী তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নতুন বর্ষপঞ্জী তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আমীর ফতেহুল্লাহ সিরাজীর ওপর। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে হিসাব কষে ফসলী সন তৈরি করেন, যা এখন আমরা বাংলা সন বলে থাকি।

ফতেহুল্লাহ ছিলেন পারস্যের সিরাজ নগরীর লোক। হিন্দুস্থানে তিনি আসেন জীবিকার সন্ধানে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানের ওপর তার অপরিসীম দখল ছিল। হিন্দুস্থানের বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের দরবারে তিনি আসেন এবং

www.nagorikpathagar.org

তার কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। সুলতান ইন্তেকাল করলে তিনি চলে আসেন সম্রাট আকবরের দরবারে। রাজা তোডরমলের অধীনে তিনি সহকারী অর্থ সচিব হিসাবে যোগদান করেন। এ সময় রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত সংস্কার কাজে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি আমিনুল হক বা রাজ্যের বিশ্বস্ত জন খেতাবে ভূষিত হন। সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সদস্য না হয়েও দরবারে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিন হাজারী মনসবদার পদ তিনি লাভ করে আমীরদের অন্তর্ভুক্ত হন। আবুল ফযল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখেছেন : প্রত্নতাত্ত্বিক সকল নিদর্শন যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবুও আমীর ফতেহুল্লাহ সিরাজীর মস্তিষ্ক ইতিহাসের উপাদানসমূহ আবার উদ্ধার করতে পারবে, এ যোগ্যতা তার আছে।

মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র হিজরী সন গণনার ভিত্তিতেই রাজস্ব আদায় হতো। হিজরী সন চান্দ্র সন হওয়ায় এ সনের মাসগুলো ঋতুর সঙ্গে তাল রেখে স্থির থাকতে পারে না। ফলে রাজস্ব আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট মাস নির্ধারণ করে দিলে কয়েক বছর পর প্রজা সাধারণ রাজস্বের ব্যাপারে বিপদে পড়তো। সম্রাট আকবরের দরবারে জনগণের পক্ষ থেকে রাজস্ব প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ে বা মাসে সম্পন্ন করার বাস্তব অসুবিধার কথা তুলে ধরে আবেদন পেশ করলে নতুন একটি সন উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই এই সনের জন্ম।

সম্রাট আকবরের নির্দেশে আমীর ফতেহুল্লাহ সিরাজী প্রচলিত সনগুলোর ওপর গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হিজরী সনের বর্ষ গণনাকে সৌর বর্ষ গণনায় এনে নতুন সনের উদ্ভব ঘটান।

হিজরী সনের সম্পর্ক চাঁদের সঙ্গে থাকায় সনটি ঋতুর সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। অন্যদিকে সৌর সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে থাকায় ঋতুর তাল অক্ষুণ্ন থাকে। চান্দ্র সন একটি ঋতু অতিক্রম করলে সেই ঋতুতে ফিরে আসতে তার সময় লাগে ৩৩ বছর আর সৌর সনের লাগে এক বছর। চান্দ্র বছর আর সৌর বছরের এই ব্যবধান (সময়ের) মাথায় রেখে ফতেহুল্লাহ সিরাজী সম্রাট আকবর যে

www.nagorikpathagar.org

বছর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, সেই বছর থেকে হিজরী সন ৩৫৪ দিন গণনার স্থলে ৩৬৫ দিন গণণা করে যে সনটি উদ্ভাবন করেন, সেই সনটিই সুবে বাংলায় এসে বাংলা সনে পরিণত হয়। ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫৫৬ থেকে হিসাব করে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমীর ফতেহুল্লাহ সিরাজী নতুন সনের প্রস্তাব সম্রাটের দরবারে পেশ করেন। সম্রাট এক ফরমানের মাধ্যমে এই নতুন সনটি প্রবর্তনের ঘোষণা জারি করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময় সুবে বাংলায় বারো ভুঁইয়া শ্রেষ্ঠ ঈসা খাঁ স্বাধীনভাবে বিশাল এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ঈসা খাঁকে দমন করার জন্য সম্রাট আকবর সুবে বাংলায় শাহবাজ খানকে প্রেরণ করেন। নতুন সনের প্রবর্তনের বছরেই অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খাঁর সঙ্গে শাহবাজ খানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সাময়িকভাবে ঈসা খাঁ পিছু হটে গেলেন বটে, কিন্তু অচিরেই তিনি শাহবাজ খানকে পরাস্ত করতে সমর্থ হন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খাঁ সোনারগাঁওয়ে তার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে, বাংলা সন ঈসা খাঁর সময়েই বাংলাদেশে এসে যায়। পরবর্তীতে ঈসা খাঁকে সম্রাট আকবর আগ্রাতে বিপুল সংবর্ধনা জানান এবং তাঁকে মসনদে আলী মার্জুবানে বাংলা খেতাবে ভূষিত করেন এবং ৩৬০০০ টাকা আয়ের লাখেরাজ ভূসম্পত্তির জায়গীর ও ২২টি পরগনার শাসনভার প্রদান করেন। সম্ভবত ঈসা খাঁ হিজরী সনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বাংলার ফসল মওসুমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নতুন সনটির ব্যাপক প্রচারে অবদান রাখেন। এক তথ্যে জানা যায়, ৯৬৩ হিজরীর মুহররম মাস ও পারসিক সুরসানী সনের ফেরীদুন মাস ধরে নতুন সন গণনা শুরু হয়।

সেই সময় সুবে বাংলায় ছিলো শকাব্দের বৈশাখ মাস। সুবে বাংলায় তাই নতুন সনের প্রথম মাস হিসেবে স্থির করা হয় বৈশাখ মাসকে। হিজরী সনের মাসগুলোর পাশাপাশি ফতেহুল্লাহ সিরাজী উদ্ভাবিত ও সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ইলাহী সন, ফসলী সন ও বাংলা সনের মাসগুলো হচ্ছে : ১। মুহররম/ফেরীদুন/ বৈশাখ, ২। সফর/ আদিবেহেস্ত/ জ্যৈষ্ঠ, ৩। রবিউল আওয়াল/খুরদাদ/আষাঢ়, ৪। রবিউস সানী/ তীর/ শ্রাবণ, ৫। জমাদিউল আওয়াল/ মর্দাদ/ ভাদ্র, ৬। জমাদিউস সানী/ শাহরিয়ার/ আশ্বিন, ৭। রজব/ মিহির/ কার্তিক, ৮। শাবান/ আবান/ অগ্রহায়ণ, ৯। রমযান/ আজর/ পৌষ, ১০। শাওয়াল/ দে/ মাঘ, ১১। জিলকদ/ বহমন/ ফাল্গুন, ১২। জিলহজ্জ/ ইস্কান্দর/ চৈত্র।

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, প্রথম যে বছর থেকে হিজরী সনকে নতুন গণনা পদ্ধতিতে এনে নতুন সনের প্রবর্তন করা হয়, সেই বছর হিজরী সনের প্রথম মাস মুহররম, বাংলাদেশে ছিলো বৈশাখ মাস। পরবর্তীতে বৈশাখ তার স্থানে স্থির থাকলেও ক্রমান্বয়ে বছর বছর মুহররমের ১০/১১ দিন করে দূরে যেতে হয়। আবার তাকে বৈশাখে আসতে ৩৩ বছর লাগে। বর্তমান হিজরী সন ১৪১৫ এবং বর্তমান বাংলা নববর্ষ ১৪০২-এর মধ্যে যে ১৩ বছরের ব্যবধান, তা ঐ ১০/১১ দিনের কারণেই। অংক করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান হিজরী ১৪১৫ থেকে বাংলা সন প্রবর্তনের হিজরী সন ৯৬৩-কে বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হয় ৪৫২। যেমন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সন প্রবর্তনের বছর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দকে বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হয় ৪৩৯। ৪৫২ থেকে ৪৩৯ বিয়োগ করলেই ১৩ বছরের রহস্য উদঘাটিত হয়ে যায়।

বাংলা সন বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের শিকড়ের সঙ্গে গ্রথিত। পাকিস্তান আমলে এই সনটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলা সনের উদ্ভাবক ছিলেন ফতেহুল্লাহ। আর সেই সনটি বহু বছর পর সংস্কারের দায়িত্ব ভার প্রদান করা হয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ওপর। বিস্ময়কর হলেও সত্য, দু'জনই সুপণ্ডিতই কেবল নন, তাঁরা দু'জনই উঁচু স্তরের সূফী ছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে বাংলা একাডেমী বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার উপসংঘ গঠন করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে এই উপসংঘ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারিতে বাংলা সন সংস্কার করেন। তাতে বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ৩০ দিনে গণনার সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্তে এটাও স্থির করা হয় যে, অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) বলে পরিগণিত হবে। চৈত্রমাস ৩১ দিনে হবে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কারকৃত বাংলা সন গণনার এই নতুন রীতি বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রচলিত হয় ইংরেজি বিংশ শতাব্দীর আশি দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। ('বাংলা সনের বিবর্তন : ফতেহুল্লাহ থেকে শহীদুল্লাহ' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত জনাব হাসান আব্দুল কাইয়ুম-এর নিবন্ধ থেকে তথ্য গৃহীত)।

www.nagorikpathagar.org

এই যে ইতিহাস আর তথ্য পরিবেশন করা হলো, তাতে তো দেখা যায়, এই সন ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু। ফসলি সন, আকবরী সন, আমাদের দেশে এসে তা হয় বাংলা সন। আমীর ফতেহুল্লাহ সিরাজী ছিলেন পারস্যের মানুষ আর আকবর ছিলেন দিল্লির লোক। উভয়ের ভাষা ছিল পার্সী। এখানে বাঙালিত্ব আনা হয় ইতিহাসের কোন্ তত্ত্বের ভিত্তিতে? যারা বলছেন, 'বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে আবহমানকাল থেকেই জড়িয়ে আছে পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ রীতি' তথ্য তাদের মোটেই সঠিক নয়। 'আবহমানকাল' শব্দটির অর্থই তারা হয়তো জানেন না। আবহমানকাল মানে অনাদিকাল। অনাদিকাল হচ্ছে আদিহীন, উৎপত্তিবিহীন। ১৬ শতকের শেষ প্রান্তে যে সনের সৃষ্টি, তা কেমন করে 'বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে আবহমানকাল থেকেই জড়িয়ে আছে পহেলা বৈশাখ' তাতো আমি বুঝতে পারি না। হিজরী সন বা ইংরেজি সনে তো বৈশাখ মাস বলে কোন মাস নেই। সম্রাট আকবরের এই নতুন সন বাংলাদেশে প্রবর্তনের আগে বর্ষবরণ উৎসব কিভাবে হতো, কারা উৎসব করতো? হিন্দু সংস্কৃতি আর বাঙালি সংস্কৃতি এক সংস্কৃতি নয়, যদিও শরৎচন্দ্রের মত কিছু লোকজন বাঙালি বলতে হিন্দুদেরই বুঝে ছিলেন।

যে বাংলা সন আমরা চার শতাধিক বছর থেকে মেনে আসছি, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ক্ষেতে-খামারে কাজ করি, ফসল লাগাই, ফসল তুলি, বছরের রুটিন তৈরি করি, সালতামামি অনুষ্ঠান করি, তেজারতে সারা বছর কি আয়-ব্যয় হলো তা হিসাব করে দেখি, নতুন খাতা খুলি, এই সনের নির্মাতা মুসলমান, প্রবর্তনকারী মুসলমান। অথচ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই, এই সনের 'বরণ' অনুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন, প্রদর্শনী এবং আমোদ-প্রমোদের অধিকাংশই ভিন জাতির সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই সনের উদযাপন অনুষ্ঠানের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত কোথাও আপনি মুসলিম কৃষ্টির কোন কিছু পাবেন না, না আমোদে, না মিছিলে, না সাজসজ্জায়, না আলোচনা সভায় কারো বক্তৃতায়। আপনি যদি ভিন দেশী হন, বাংলা সনের ইতিহাস না জানেন, তাহলে মনে করবেন, অমুসলিমদের কোন অনুষ্ঠান চলছে, সে অনুষ্ঠান মুসলমানের নয়, এর সাথে মুসলমানদের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

বাংলা বর্ষবরণ রাজধানীতে কিভাবে পালন করা হয়, সে চিত্রটাই দেখুন।

www.nagorikpathagar.org

দেখার পর বলতে পারবেন, তাতে মুসলিম অংশ কতটুকু আর মুসলিম আদর্শের পরিপন্থী কতটুকু। প্রতি বছর যা হয়, যেভাবে হয়, তেমন একটি চিত্র আমি এখানে তুলে ধরছি।

প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ প্রভাত থেকে শুরু হয় বিশেষ একটি গান বা কবিতাবন্দি ক্যাসেটের বিরতিহীন গান-বাজনা দিয়ে। 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ তাপস/ নিঃশ্বাস বায়ে মুমুর্ষুরে দাও উড়ায়ে'। এ গানের শত শত ক্যাসেট বাজতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। ঝরা পাতার নুপুর বাজিয়ে চৈত্রের বিদায়ের সঙ্গে রাজধানীর অনেক তরুণ-তরুণী জেগে উঠে, মেতে উঠে, নতুন সাজে নিজেদের সাজিয়ে তোলে। 'জীর্ণ, পুরাতন যাক ভেসে যাক' গানে গানে সুরে সুরে পহেলা বৈশাখের প্রভাত হেসে উঠে, আবৃত্তি ও গানের সুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়, অনুরণিত হয় প্রতিজনে ও জনপদে এবং নগর পরিবেশে।

রমনা বটমূলে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট অনুষ্ঠান। ভোর থেকে জমে উঠে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তারা গান শুনতে আসে, নাচ দেখতে আসে, আবৃত্তিকারদের আবৃত্তি শোনে, বিচিত্র বর্ণের পোস্টার দেখে, বক্তৃতা শোনে রমনা বটমূলে। প্রথম প্রভাতে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসো হে বৈশাখ এসো, এসো, আবাহনী সঙ্গীত হিসেবে। প্রেসক্লাব থেকে শাহবাগ এবং পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বাংলা একাডেমী এলাকা থাকে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নানা বয়সের মানুষের পদভারে আর গুঞ্জরণে সরগরম। উদযাপনকারী সকলের না হলেও অধিকাংশ পুরুষের পরিধানে থাকে পাঞ্জাবী-পাজামা, পাঞ্জাবী -প্যান্ট, অনেকের থাকে দু'কাধে ঝুলানো ভাজ করা চাদর। চারুকলা ইনস্টিটিউট, টিএসসি চত্বর অথবা এ এলাকার অন্য কোন স্থান থেকে বের হয় পহেলা বৈশাখ 'বরণ' মিছিল, মঙ্গল শোভা যাত্রা নামে। এ শোভা যাত্রায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী যোগ দেয়। মিছিলটি প্রেসক্লাব, শাহবাগ এলাকা ঘুরে টিএসসি বা চারুকলা ইন্সটিটিউট অঙ্গনে এসে শেষ হয়। যারা মিছিলের সম্মুখভাগে থাকেন, তাদের সকলের না হলেও অনেকেই (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) চেহারা (মাথাসহ) মুখোশ দিয়ে ঢাকেন। এই ঢাকাঢাকি বাধ্যতামূলক। মিছিলের সম্মুখ ভাগের লোকজন ছাড়াও গোটা মিছিলে অনেকের মুখে মুখোশ দেখা যায়। এই

www.nagorikpathagar.org

মুখোশগুলোর চেহারার সঙ্গে জন্তু জানোয়ার, মাছ, শয়তান, রুদ্র ভৈরবী, কালীর চেহারার মিল থাকে। কুকুর, বিড়াল, হাতি, সাপ, গন্ডার, বাঘ, সিংহ, ভল্লুক, কচ্ছপ, মাছ, ময়ূর, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, বানর ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারের মুখোচ্ছবির অনুকরণে মুখোশের চেহারা অংকন থাকে। কোন কোন বছর বিশেষ জন্তু-জানোয়ার ও প্রাণীর ড্যামি খড়-কুটো দিয়ে তৈরি করে বহন করা হয় মিছিলে। ১৪০৩ বাংলা সালের মিছিলে ৪০ ফুট লম্বা মাছের ড্যামি বহন করা হয় মিছিলে। কোন বছর কচ্ছপের আর কোন বছর ময়ূরের, এক এক বছর এক এক রকম প্রাণীর ড্যামি থাকে। বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠী শিশু পার্কে, বাহাদুর শাহ পার্কে এবং অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে, কোথাও নাচের আসরও বসে। জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাউল গানের উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন ট্রাকে মঞ্চ করে নেচে গেয়ে শহর ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করে। রমনা এলাকায় নানা পণ্যের মেলা বসে। পান্তা ভাত-ইলিশ মাছের দোকানও বসে। তরুণী যুবতীরা দোকান খোলেন, তরুণরা হন পান্তা ভাত ইলিশ মাছের খদ্দের। তরুণী, যুবতীরা তাদের রান্না করা ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত যুবকদের মুখে তুলে দেন। এমন দৃশ্য অনেকেই নজরে পড়ে প্রতিবছর। নানা পণ্যের বাজার বসে। এ বাজারে পান্তা ভাত ইলিশ মাছ তো থাকেই, এমনকি জামা-কাপড়ও থাকে এবং শিশুদের খেলনাও থাকে। কাঁচের চুড়ি, বাঁশী ও বিশেষ টুপিও থাকে নববর্ষের মেলায় অন্যতম পণ্য হিসেবে।

বাংলা সাল আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যের দেহ জড়িয়ে আছে। সেই সন উদযাপনে মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অন্তত ছায়াটুকু পড়বে, তা সঙ্গতভাবে আশা করা যায়, কিন্তু সে ছায়া কখনো দেখা যায়নি। আমি কয়েক বারই এই রাজধানীতে নববর্ষ উদযাপনের নানা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলা ১৪ শত সাল বরণ অনুষ্ঠানও দেখেছি। সে অভিজ্ঞতাই এখন বলছি।

রাজধানীতে এই মহোৎসব উদযাপনের কয়েকটি দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অধিকন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠ করেও জেনেছি অনেক খবর। আর সারা দিন যারা নানা দৃশ্য দর্শনের জন্য গোটা রাজধানী উষা থেকে নিশা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদের থেকে আহরণ করেছি মূল্যবান কিছু খবরাখবর। সব মিলিয়ে সংগ্রহ হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

অনেক, কিন্তু এই পরিসরে সব সংগ্রহ পরিবেশন সম্ভব নয়। তবে কাটছাঁট ও বাছাই করে যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তা এখানে পেশ করছি। তাতে অবশ্য আমার নিজস্ব সংগ্রহ যেমন আছে, তেমনি আছে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট।

এক : ১৩৯৯ সালের চৈত্রের শেষ সূর্যাস্তের সময় কোথাও কোথাও উলুধ্বনি দেয়া হয়। পটকার আওয়াজ শোনা যায় সর্বত্র। রাত বারোটার পরও অজস্র পটকার আওয়াজ রাজধানীর নীরবতা ভঙ্গ করে। মনে হয়েছিল যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দুই : জানা যায়, ঐ রাতে অনেক বাসায় গরম ভাত রান্না করে হাঁড়ির ভাতে পানি দিয়ে পান্তা বানিয়ে রাখা হয়। সকালে তা অনুষ্ঠান করে গিলে ১লা বৈশাখের প্রথম নাস্তা ভোগের উদ্বোধন করা হয়। ফ্রিজবিহীন পরিবারে দেশজ পদ্ধতিতে পান্তা বানিয়ে সকালের নাস্তা করেন অনেকে।

তিন : বারোয়ারী বিলাসিনীরা ভোরে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে বাসা থেকে বের হয়ে পড়েন বাংলা একাডেমী এবং সোহরাওয়ার্দী-রমনা উদ্যানের দিকে। সেখানে বৈশাখী মেলা বসে, পান্তা ভাত বিক্রির দোকান খোলা হয়। মাটির ছোট বাটির এক বাটি পান্তা ভাত, এই সাথে একটা পিঁয়াজ ও দুটি কাঁচা মরিচ ২৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়। ললনারা নিজ নিজ গাড়ি থেকে বের হয়ে পান্তা ভাত বিরিয়ানীর মূল্য দিয়ে খান। কেউ কেউ ড্রাইভার দিয়ে আনিয়ে গাড়িতে বসে পান্তা ভাত গলাধঃকরণ করেন। পান্তা ভাত খাওয়ার নিজ নিজ দৃশ্যের ছবিও অনেকে তুলিয়ে নেন। আমার এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার বাসায় গিয়ে দেখেছি এমন এক দৃশ্যের ছবি, তিনি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান্তা ভাত খাচ্ছেন।

চার : সোহরাওয়ার্দী ও রমনা উদ্যানে পান-সিগারেট ও চায়ের দোকান ছিল কয়েকটি। সে সব দোকানে ছিল খদ্দেরদের প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের কারণ ছিল, এসব দোকানের বিক্রেতারা ছিলেন নব সাজে সজ্জিতা যুবতীরা। তাদের হাতের পরশে ধন্য দু'টাকা মূল্যের একটি সিগারেট ৫ টাকায় এবং চা এক কাপ ৫ টাকা আর তাদের কোমল হাতের তৈরি এক একটি পানের মূল্য ছিল সর্বনিম্ন তিন টাকা। কেউ কেউ নাকি এক খিলি পান খেয়ে ১০ টাকা এমনকি ৫০ টাকার নোটও দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, এ সবের প্রায় সব খদ্দেরই ছিলেন বয়সে পনের থেকে পঁচিশ, যারা নিজেদের ছাড়া কারো করে নাকো কুর্ণিশ।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ : বর্ণাঢ্য জংলী মিছিল এই উৎসবের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। লেখাপড়া জানা, নগর-জীবন যাপনে অভ্যস্ত যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীরা মুখে মুখোশ পরে, মুখে ছাই মেখে অদ্ভূত পোশাকে সজ্জিত হয়ে যেভাবে জংলী রূপ ধারণ করেছিল, তা দেখলে হয়তো আসল জংলীরা শরমে মুখ লুকাতো।

ছয় : শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হাতী, ঘোড়া, গরুর গাড়ি, ঢোল-শোহরতসহ বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়।

সাত : কলকাতায় রেডিও-টিভিতে ১৪০০ সাল উদযাপনের কোন অনুষ্ঠান-প্রোগ্রাম না থাকলেও কলকাতা থেকে অনেকেই এই রাজধানীতে এসেছিলেন উৎসব উদযাপনের জন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাদেরই অন্যতম।

আট : মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে শতাব্দীর মহামানব ঘোষণা করা ছাড়াও শতাধিক ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ মানব ঘোষণা করা হয়। এই তালিকায় এপার আর ওপার বাংলার নারী ও পুরুষ ছিলেন।

নয় : চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতিসহ মুখোশ পরিহিত অবস্থায় বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা বের করে। তারা ঘোড়া, কুকুর, লক্ষ্মীপেঁচার খোলস তৈরি করে তার মধ্যে দেহ লুকিয়ে এবং বিড়াল পেঁচা ও দৈত্য-দানবের মুখোশ পরে শোভা যাত্রায় অংশ নেয়। এছাড়া তারা শোভা যাত্রায় হাতী ও বাঘের প্রতিকৃতি ভ্যান গাড়িতে করে টেনে নেয় এবং মাথার উপরে কচ্ছপ বহন করে।

দশ : ঐ দিন মঙ্গল শোভা যাত্রা বের হয়। যারা এই মঙ্গল শোভা যাত্রা বের করেন, তাদের পরনে ছিল ধূতি আর মাথায় বাঁধা ছিল লাল পট্টি। শোভা যাত্রায় তারা উলুধ্বনি দিতে থাকে।

এগার : ১৪শত সাল বরণের তিন দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান শেষে শেখ হাসিনা শতাধিক মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলা দেবীর পূজা করেন।

বারো : কোন কোন উদযাপন কমিটি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

তাদের অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং বাংলা সালের উপর সুধীদের আলোচনার পর মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তের : নাচ-গানের আসর বসে বিভিন্ন স্থানে। রেডিও-টেলিভিশন বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপহার দেয়।

চৌদ্দ : নেতৃস্থানীয় দৈনিকগুলো এ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

মোটামুটিভাবে এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রাজধানীতে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু ও সম্পন্ন হয়। তবে ঐ দিন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন জায়গায়।

হিজরীভিত্তিক বাংলা সন বরণ উৎসব এভাবে উদযাপন কি উচিত হয়েছে? যদি উচিত না হয়ে থাকে তাহলে এমন কেন হলো? এ প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

উচিত অনুচিত একটি আপেক্ষিক শব্দ বলে অনেকেই মনে করেন। যারা লক্ষ্যচ্যুত, তাদের জীবনের ব্যাকগ্রাউন্ডে নেই কোন মূল্যবোধ। ডানে-বামে নেই কোন সঠিক গাইড আর সামনে নেই কোন দিশারী। তাই মানব দেহে মানব মাথা থাকা সত্ত্বেও তারা জন্তু-জানোয়ারের মাথার প্রতিকৃতি নিজেদের মাথায় চাপায়, নিজেদের জাতীয় ধ্বনি বাদ দিয়ে বিজাতীয় উলুধ্বনি দেয়, অন্য জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে আর নিজ ধর্মের সীমানায় থেকে আল্লাহর কাছে মঙ্গল ভিক্ষা না করে মঙ্গলা দেবীর নামে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল ভিক্ষা করে। তাদের কাছে উচিত অনুচিতের প্রকৃত সংজ্ঞা নেই, সীমানাও নেই। তারা তাই করে যা তাদের মন চায়। তারা আলোর চেয়ে আলেয়াকে বেশি ভালভাসে। স্বধর্মের পরিচয়-পরিচিতি তারা ত্যাগ করে না সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে, কিন্তু পরধর্ম ও পরকীয়া সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আর আসক্তি তাদের প্রবল। শয়তান এ ব্যাপারে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করে থাকে।

এই উৎসব উদযাপনের নানা দৃশ্য অবলোকন করে আমার তো মনে হয়েছে যে, ঐতিহাসিক এই শতক আর সালটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ, ঐতিহাসিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিকে ভিত্তি করে বরণ উৎসব উদযাপন করা উচিত

www.nagorikpathagar.org

ছিল, কিন্তু বিশেষ দু'চারটি সংস্থা ছাড়া এদিকটার প্রতি অন্য কোন সংস্থা খেয়ালও করেনি। ফলে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ-নাচে মাঠে মারা গেছে। উলুধ্বনি দিয়ে ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে।

যেভাবে উৎসব করা হলো, অনুষ্ঠান যেভাবে উদযাপিত হলো, তাতে আমার মনে হলো, বিশেষ চিহ্নিত মহলের রাজনৈতিক দর্শনই প্রাধান্য পেয়েছে আর সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিকে ঐ মহলটিও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। কারণ, ঐ মহলটি তাদের লেখিয়াদের দ্বারা উৎসব শুরুর পূর্ব থেকে, এমনকি উৎসব শেষের পরও বিভিন্নভাবে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, এই সাল তৈরিতে মুসলমানদের কোন অবদান নেই, হিন্দু রাজা-মহারাজারা এ সালের প্রবর্তন করেন। সুতরাং উদযাপন রীতি-পদ্ধতিতেও সেই দর্শনের প্রভাব দেখা গেছে অত্যধিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মূল তথা আদি ও সঠিক ইতিহাসের যারা ধারক-বাহক, যারা দাবি করেন বাংলা সন মুসলমান জ্যোতির্বিদ আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর মস্তিষ্কপ্রসূত, তাদের তৎপরতা ছিল না কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। নীরবে-নির্জনে বা সঙ্গোপনে তারা অনুষ্ঠান করেছেন, কিন্তু ইতিহাসকে তারা দশের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেননি। তাই অপসংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতি দ্বারা লালিত রাজনৈতিক দর্শনের বাদ্য-বাজনা বেজেছে বেশি। সত্য ও সঠিক পথের পথিকরা তাদের সঠিক দাবি নিয়ে মনজিলে পৌঁছাতে পারলেন না। বাতিলপন্থীরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে এক হাত দেখিয়ে দিয়ে বিজয় পতাকা কেড়ে নিল। দুঃখ শুধু এই।

www.nagorikpathagar.org

এক নববর্ষে রাজধানীতে ময়ূর মূর্তি নিয়ে মঙ্গল শো

www.nagorikpathagar.org

া বৈশাখে এবার (১৪/৪/৯৭) জীব-জানোয়ার রাক্ষসখোক্ষসের মু
মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়

নীতে চারুকলা ইন্সটিটিউট থেকে (১৪/৪/৯৬) বাংলা নববর্ষে
শর মঙ্গল মিছিল বের হয়

www.nagorikpathagar.org

বাংলা নববর্ষ আর পান্তা ভাত

[বছরে একবার সবল হাত-পা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান এক শ্রেণীর যুবক পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে অন্যের হাতে তোলা পান্তা ভাত খাওয়ার অভিনয় করতে দেখে একটা আশংকার কথা বার বার মনে পড়ে আর তা হচ্ছে এই, আমাদের সুস্থ-সবল যুব সমাজ হাত-পা থাকতে সত্যিই কি পঙ্গু এবং অবশ হওয়ার পথে পা বাড়িয়েছে? তাদের এই ব্যাধি শেষ পর্যন্ত কি মহামারী আকারে গোটা জাতিকে আক্রান্ত করবে? চরিত্রের দিক থেকে যারা পঙ্গু সাজে বা পঙ্গু হয়ে যায়, তাদের চেয়ে সদরঘাটে দেখা এই ভিক্ষুক-ভিক্ষুকনীর খাওয়ার দৃশ্যটি রুচি ও নৈতিকতার দিক থেকে অনেক উন্নত নয় কি?]

www.nagorikpathagar.org

নববর্ষ উদযাপনের নিয়মনীতি ও রীতি কি? উত্তর হচ্ছে এই, চিরাচরিত কোন রীতিনীতি নেই। রীতিনীতি না থাকার কারণে উদযাপন কর্মসূচিতে যা ইচ্ছা তা যোগ হয়, বিয়োগও হয়। বস্ত্র হরণও যোগ হয়েছে কয়েক বার। রাস্তায় নেমে হৈ-হুল্লোড় করা, মোটর গাড়ির হর্ণ বাজিয়ে রাতের নীরবতা ভঙ্গ করা, মদ্য পান করে মাতাল হয়ে মাতলামী করা, নেংটা হয়ে নৃত্য করে উন্মাতাল হওয়া আর এ সুযোগে পথচারীদের সর্বস্ব ছিনতাই করা, অর্থাৎ বর্বরতার কিছুই বাদ যায় না।

বোমা ফাটানো, ফাঁকা গুলি করা আর গাধার মত চিৎকার করে জনপদ অস্থির করে তোলা তো সে রাতের আবশ্যকীয় পালনীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ইংরেজি নববর্ষ পালনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বেলায় ভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হলেও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের কিছু কর্মসূচিও তাতে থাকে। ধীরে ধীরে নিয়মে হয় পরিণত। নববর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই কোন না কোন আইটেম যোগ হচ্ছে আবার বিয়োগও হচ্ছে। বাংলা নববর্ষ শুরুতে অর্থাৎ মোগল সম্রাট আকবরের আমলে নবান্ন উৎসব হিসেবে উদযাপিত হতো। কৃষকের ঘরে নতুন ফসল উঠতো। এ উৎসব পরবর্তী সময়ে সালতামামী উৎসব হিসেবে উদযাপিত হতে থাকে। ব্যবসায়ীরা তাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ের সঙ্গে বছরের হিসেব করে দেখেন লাভ লোকসান কি হলো। এ রেওয়াজ এখনও অনেক ব্যবসায়ী পালন করে থাকেন। নতুন খাতা খোলা হয়, বকেয়া আদায় করা হয়, পাইকার-খদ্দেরদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই তো হলো সালতামামী বা বাংলা নববর্ষের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান আর উৎসব। আজকাল অর্থ-বছর শুরু হয় ১লা জুলাই, শেষ হয় ৩০শে জুন। অধিকাংশ বাঙালী ব্যবসায়ী ইংরেজি আর্থিক বছরের হিসেব রাখেন। ফলে বাংলা সালতামামীর হিসেবের মহাজনদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এর ফলে রঙ-তামাশা আর বেহায়াপনার দিকে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান ঝুঁকে পড়ছে। তাই তো আমরা দেখি, বাংলা নববর্ষের উদযাপন অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা, নতুন রঙ-তামাশার সংযোজন। এই নতুন রঙ-তামাশার বেলেল্লাপনার আয়োজনের পর যা দেখা যায়, তার নাম দেয়া হয়েছে 'বাঙালি সংস্কৃতি'।

www.nagorikpathagar.org

এই সংস্কৃতির এমন এক সম্মোহনী শক্তি রয়েছে, যে শক্তি আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর যুবক-যুবতীকে ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন সাজে, ভিন্ন ভঙ্গিমায় এই দিন ময়দানে নামায়।

প্রতি বছর রমনা পার্কের বটমূলে আর বাংলা একাডেমী চত্বরে, সামনের ফুটপাতে পান্তা ভাতের বেচাকেনার হাট বসে। পান্তা ভাতের দোকানীরা হন অভিজাত পরিবারের গরবিনী ললনারা, যারা প্রজাপতির মত মনের রঙ মিলিয়ে শখের পাখা মেলে কিশোর ও যুবকদের সামনে হাজির হন বছরে একবার পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ নিয়ে।

প্রাচুর্যের মধ্যে তারা লালিত-পালিত হলেও বছরে একদিন তারা পান্তা ভাত বিক্রি করার জন্য ফুটপাতে নামেন। সারা বছর যারা ফুটপাতের বাস্তুহারা ও ছিন্নমূলদের কাছে বা নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ভাত-রুটি বিক্রি করেন, অভিজাত ঘরের দুলালীরা ঐ মাতারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন নববর্ষের এই দিনে। পার্থক্য শুধু এই, ফুটপাতের ভাত বিক্রেতা মাতারীরা তাদের খদ্দেরদের মুখে ভাত তুলে দেন না, খদ্দেররা নিজ হাতেই নিজ নিজ পাতের ভাত খায়। কিন্তু অভিজাত ঘরের ললনারা তাদের খদ্দেরদের মুখে ভাত তুলে দেন। এই খদ্দেরদের মুখে ভাত তুলে না দিলে খদ্দেররাও খান না। আজব এক সোহাগী ব্যবস্থা। বছরে ঐ দিন পান্তা ভাত খেকোরা ইচ্ছা করে দু'টি হাতকে অবশ করে নেন। এমনভাবে তারা ললনাদের দোকানের সামনে বসে হা করেন, কোন না কোন ললনা ভাত মুখে তুলে না দিলে তারা খাবেনই না। মা যেমন তার সন্তানকে কোলে নিয়ে ভাত খাওয়ান, ঠিক অনুরূপভাবে তারা তাদের খদ্দেরদের ভাত খাওয়ান। তবে পার্থক্য শুধু এই, খদ্দেররা ললনাদের কোলে বসেন না, কোলে নেয়ার মত শক্তি তাদের থাকলে আর কোলে ওঠার মত সুযোগ থাকলে তারা নিশ্চয়ই কোলেও উঠতেন।

পান্তা ভাত যারা মুখে তুলে দেয়, আর যারা হা করে তা গলাধঃকরণ করে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মুসলিম যুবতী ও যুবক। শুধু তাই নয়, কেউ কারো স্ত্রী নয়,

www.nagorikpathagar.org

কেউ কারো স্বামীও নয়। স্বামী-স্ত্রী হলেই বা কি, কোন্ স্ত্রী স্বামীকে মুখে তুলে ভাত দেন? এই রঙবাজির অর্থ কি? এর কোন অর্থ নেই। নিজ গৃহের উন্নতমানের আহার ব্যঞ্জন মা, স্ত্রী, বোন-ভাবীর পরিবেশনায় খেতে অনীহা প্রকাশ করে ঐ দিন ফুটপাতে দুর্বাঘাসের ওপর বসে অপরিচিতা কিশোরী-যুবতীদের হাতে তোলা পান্তা ভাত খেতে যারা যায়, তারা পতিত মানসিকতাসম্পন্ন, আর যারা মুখে তুলে দেয় তারা বাজারী পতিতা মানসিকতাসম্পন্ন নারী।

বছরে একটি দিনের জন্য ঐ যুবকরা পক্ষাঘাত রোগে কি আক্রান্ত হয়? কি যাদু আছে এই কিশোরী-যুবতীদের হাতে? যুবকরা পান্তা ভাতের বাজারে আসে বীর বিক্রমে। কিন্তু ললনাদের পান্তা ভাতের দোকানে আসা মাত্রই তাদের হাত অবশ হয়ে যায়। মেলায় এসে পান্তা ভাত ব্যবসায়ী পতিতা চরিত্রের নারীদের দেখামাত্র তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের হাতে তোলা পান্তা ভাত খাওয়ার জন্য যুবকরা হাঁস-মোরগ আর চতুস্পদ জন্তুর মত গলা বাড়িয়ে দেয়। কি যে এক অপূর্ব রোমান্টিকতার আবেশে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে তা শুধু জানে খানেওয়ালা আর খাওয়ানেওয়ালীরা। বাজারী ললনারা এই সুযোগে হাতিয়ে নেন তাদের থেকে বড় বড় নোটগুলো।

কবি বলেছিলেন, পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়,গরু চরাতে পাচন হাতে রাখাল গেয়ে যায়। রাখলের পান্তা ভাত, কিষান-কিষানীর পান্তা ভাত, গাঁও-গেরামের মানুষের পান্তা ভাতই শহর-নগর আর এই রাজধানীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার ফ্রিজে চলে এসেছে।

ফ্রিজ থেকে চলে গেছে মাঠে-ময়দানে আর মেলায়। পান্তা দিয়ে শিকার করা হচ্ছে পান্তাখোর প্রেমবিলাসী যুবকদের। রাজধানীতে ১লা বৈশাখ হচ্ছে পান্তা দিয়ে প্রেম নিবেদন আর বরণের দিবস। পান্তা ভাতের প্রেম আর গরম ভাতের প্রেমের পার্থক্য আছে। পান্তা ভাতের প্রেম মাত্র একদিনই কভারেজ পায়।

বর্ষবরণের পহেলা দিনে ললনাদের পান্তা ভাতের দোকান খোলা আর ধনীর দুলালদের পার্কের বা লেকের ধারে বসে তা গলাধকরণ করা কোন্ সংস্কৃতির পরিচায়ক, তা বুঝতে পারলাম না, জানতেও পারলাম না।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান সংস্কৃতিতে এসব নেই। মুসলিম সংস্কৃতিতে তা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এটা বোধ হয়, আমাদের বাংলাদেশী অধঃপতিত মুসলিম যুবক-যুবতীদের নব্য কোন সংস্কৃতির উদ্ভাবন।

দুঃখজনকভাবে লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, বয়স্ক যে সব পুরুষ সারি বেঁধে রমনা পার্কের ঘাসের উপর বসে বাজারী ললনাদের হাতে পান্তা ভাত গিলেন, তারা ঈদের দিনেও পরিবারের সকল সদস্যকে সাথে নিয়ে আহার করেন না। কারণ, তাদের ফুরসৎ নেই। বাহিরের বিনোদন নিয়ে তারা থাকেন মহাব্যস্ত। এই শ্রেণীর নরনারী ধর্মের বিরুদ্ধে, ফতোয়ার বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। যে সব বিবাহিতা ললনা সারা বছর বাসায় চাকর-চাকরানীদের জন্য বাসী ভাতকে পান্তা ভাত বানিয়ে খেতে দেন, তাদের একটি শ্রেণী বছরে একদিন পান্তা ভাতের বেপারী সেজে রমনা পার্কে দোকান খোলেন বড় ঘরের ছেলেদের টেকের টাকা উজাড় করার জন্য। বিচিত্র সংস্কৃতি! বিচিত্র জীবন বোধ আর বিচিত্র তাদের মানসিকতা! মাথায় যাদের টাকার শিং গজায় তারা চুলকানিতে ভীষণ ভোগেন। এই চুলকানির জ্বালার উপশম এভাবেই ঘটিয়ে থাকেন।

নববর্ষ বরণের এ হলো একটি মাত্র কর্মসূচি। আরও অনেক কর্মসূচি আছে। যেমন এই দিন যুবকদের পাজামা-পাঞ্জাবী পরতেই হবে, পায়ে দিতে হবে চটি জুতা। হাতে থাকতে হবে কোন না কোন ফুল। জোড়ায় জোড়ায় (স্বামী-স্ত্রী নয়) উদ্যানে হাঁটতে হবে। লেকের পাড়ে বসে ছোট ছোট নুড়ি লেকের পানিতে নিক্ষেপ করে ঢেউ তুলতে হবে। গানের গলা থাকলে দু'জনকে গুন গুন করে গান গাইতে হবে।

মেয়েরা পরবে বিশেষ রঙের শাড়ি। খোঁপা সাজাবে ফুল দিয়ে, হাতেও থাকবে ফুলের মালা। কপালে তো অবশ্যই টিপ থাকবে। নাচ-গানের আসর তো বসবেই। বটমূলেই সাধারণত এই আসর বসে। এ আসর জমে ওঠে সাধারণত পড়ন্ত বেলা থেকে রাত ৯টা বা ১০টা পর্যন্ত। এ সময়টাই প্রায় প্রতি বছর একাধিক

www.nagorikpathagar.org

ললনার বস্ত্রহরণ করা হয়। আসলে এটা বস্ত্রহরণ নয়, রীতিমত বস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। নাম দেয়া হয় দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ। যাদের বস্ত্রহরণ হয় তারা যেহেতু দ্রোপদীপন্থী, তাই মনে করেন পূণ্যের কাজ।

১৯৯৪ সালের ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ ১ বৈশাখ রমনা উদ্যানের বটমূলে হাজার হাজার মানুষের সামনে যেভাবে ললনাদের বস্ত্রহরণের মহোৎসব হলো তা পত্র-পত্রিকায় অনেকেই এর কাহিনী ও ছবি দেখেছেন। সে সময় পরকীয়া সংস্কৃতিপন্থীরাও প্রশ্ন তুলেছিলেন, নারীর বস্ত্র নিয়ে টানাটানি, যুবতীদের ওপর যুবকদের ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রকাশ্যে চুমু দেয়া পাশ্চাত্য সমাজে হয়তো দোষনীয় নয়, কিন্তু আমাদের সমাজের সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি তো বাঙালি সংস্কৃতি কি বস্তু তা বুঝলাম না। বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলছেন? পঞ্চসতীর নাম জানেন? সে সব সতী তো দেবী লীলায় অসতী হয়েই সতী হয়েছেন। বটমূলে বা উদ্যানে বা ক্যাম্পাসে যা হয়, তাতো বাঙালি সংস্কৃতি বা ইংরেজি সংস্কৃতিরই অনুশীলন হয়। চুলকানি আছে বলেই তো চুলকানির উপশমের জন্য সেখানে যায়।

আমরা কি বর্ষবরণ এই দুই সংস্কৃতির অনুকরণে উদযাপন করতে চাই? অপসংস্কৃতির জোয়ারে সমাজ এমনিতে তলিয়ে যাচ্ছে, নিমজ্জমান জাতিকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন। ঘরে ঘরে পতিতা সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না। দেহ ব্যবসায়ী আর রূপের ব্যবসায়ী, উভয়ই পতিতা। এদের পুরুষ খদ্দেরগুলো লুচ্চা-বদমায়েশ!

সংযোজন : গত ২৩ এপ্রিল ১৯৯৪ (শনিবার) সদরঘাটের মোড়ে অবশ হাত বিশিষ্ট লিলিপুট সাইজের এক পঙ্গু ভিক্ষুককে দেখলাম।এক মহিলা নিজ হাতে তার মুখে তুলে ভাত খাওয়াচ্ছে। ভিক্ষুককে তার স্ত্রী মুখে তুলে ভাত খাওয়ানোর এই দৃশ্য দেখে রমনা পার্কে অনুষ্ঠিত পান্তা ভাত খাওয়া আর

www.nagorikpathagar.org

খাওয়ানোর রোমান্টিক প্রেমমেলার কথা মনে পড়ে গেল। সদরঘাটের ফুটপ
যে লোককে খাওয়াতে দেখেছি, সে এক ভিক্ষুক। হাত দু'খানা অবশ। নিজ হ
কিছু মুখে তুলতে পারে না। তাই তার স্ত্রী বা বোন বা অন্য সম্পর্কের কেউ
তুলে দিচ্ছে আহার। কিন্তু রমনা পার্কে যারা যুবতীদের মুখে পান্তা ভাত ে
দেখা গেছে, তাদের কেউ অবশ নয়। যাদের হাতে ওরা পান্তা ভাত খাচ্ছিল তা
কোন সম্পর্ক নেই এই যুবকদের সঙ্গে একমাত্র প্রেমের পান্তা ভাত গিলার বিনি
অর্থ দান ছাড়া। এ কারণে সদরঘাট আর রমনা পার্কের দৃশ্যের তুলনা করলাম।

বছরে একবার সবল হাত-পা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান এক শ্রেণীর যুবকের প
বিকলাঙ্গ হয়ে অন্যের হাতে তোলা পান্তা ভাত খাওয়ার অভিনয় করতে ে
একটা আশংকার কথা বার বার মনে পড়ে আর তা হচ্ছে এই, আমাদের সুস্থ-স
যুব সমাজ হাত-পা থাকতে সত্যিই কি পঙ্গু এবং অবশ হওয়ার পথে পা বাড়িয়ে
তাদের এই ব্যাধি শেষ পর্যন্ত কি মহামারী আকারে গোটা জাতিকে আক্রান্ত কর
চরিত্রের দিক থেকে যারা পঙ্গু সাজে বা পঙ্গু হয়ে যায়, তাদের চেয়ে সদর
দেখা এই ভিক্ষুক-ভিক্ষুকনীর খাওয়ার দৃশ্যটি রুচি ও নৈতিকতার দিক ে
অনেক উন্নত নয় কি?

১লা বৈশাখে রমনা বটমূলে মাটির সানকিতে পান্তা ভাত খাচ্ছেন, ছবিতে যুবতী ও এক যুবককে পান্তা ভাত খেতে দেখা যাচ্ছে ছবি (১৪/৪/৯৬)

www.nagorikpathagar.org

এক যুবতী আর এক যুবকের মুখে পান্তা ভাত তুলে দিচ্ছেন। সবল সুস্থ যুবকই যুবতীর হাতে তোলা পান্তা ভাত খাওয়ার জন্য যেন আতুড়, লুলা, লেংড়া হয়ে গিয়েছিলেন ১লা বৈশাখে। ছবি তোলা হয় ১৪/৪/৯৬ তারিখে রমনা পার্কে।

www.nagorikpathagar.org

বর্ষবরণের আকর্ষণ : বটতলায় বস্ত্রহরণ

[আমাদের দ্রৌপদীদের বস্ত্র নিয়ে সে দিন দুঃশাসনরা যেভাবে যে এলাকায় টানাটানি করতে থাকেন, সে এলাকায় অনেক পাণ্ডবও ছিলেন। দ্রৌণাচার্য ছিলেন, হয়তো ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, এমনকি ভীমরাও ছিলেন; কিন্তু কেউ কিছু বললেন না, বাধা দিলেন না, ভীমদের বিক্রমও দেখা গেল না। তাহলে কি সবাই দুঃশাসনের দলে ভিড়েছিলেন? হয়তো কেউ কেউ ছিলেন টানাটানিতে আর কেউ কেউ ছিলেন তামাশা দেখতে? চিন্তা করুন, ভাবুন, তারপর বুকে হাত দিয়ে জবাব দিন- এ সব কি ফতোয়াবাজির ফল, না ফতোয়া না শোনার প্রতিফল?]

www.nagorikpathagar.org

[রচনা : ৮ মে ১৯৯৪ সাল : রাজধানী ঢাকায় বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ, ১৪০১ (১৪ই এপ্রিল ১৯৯৪) উদযাপিত হয় যেভাবে, তারই বিবরণ এবং আমার এ সম্পর্কিত আলোচনা নিয়েই এ নিবন্ধ রচিত।]

বস্ত্রহরণ, সম্ভ্রমহরণ, পান্তা ভাত গলাধঃকরণ প্রসঙ্গ এভারগ্রীন অর্থাৎ চির সবুজ। কখনো বাসি হয় না। পচন ধরে না। বরবাদ হয় না। ভিন্ন লবির একটি দৈনিকের প্রতিনিধি ২৭শে এপ্রিলের সংখ্যায়ও করুণ বিবরণ দিয়ে নানা জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছেন। সংবেদনশীল মনের অভিব্যক্তি হৃদয়স্পর্শী হয়ে থাকে। আমার হৃদয়কেও সেই চিত্রাঙ্কন নাড়া দিয়েছে। তাঁর বেদনাহত হওয়ার ভিত্তি বা কারণ হয়তো আমার বেদনাহত হওয়ার ভিত্তি ও কারণ থেকে ভিন্ন। ভিন্ন এ জন্য বললাম যে, সে দিন যদি বস্ত্রহরণ আর সম্ভ্রমহরণের ঘটনা না ঘটতো, তাহলে সহযোগী বন্ধু কোন আফসোস করতেন না বরং তালিয়া বাজিয়ে মেলার ম্যালা তারিফ করতেন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার ভূয়সী প্রশংসাও হয়তো করতেন এবং কোরমা-পোলাওকে কাঁচা মরিচ আর পান্তা ভাতের নিচে স্থান দিতেন। সে দিন কিন্তু কোন অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটলেও আমি সমানভাবে বেদনাহত হতাম। বেদনাহত হতাম এ জন্য যে, এমন ধারার চালচলন আর নষ্টিফষ্টির নাম মেলা নয়, 'বরণ' অনুষ্ঠানও নয় আর তা সংস্কৃতিও নয়। এই ধারাটা আমাকে অবশ্যই ব্যথা দেয়, অঘটনের ঘটনা ঘটার খবর পাঠ করে ব্যথাটা আরও তীব্র হয়। সুতরাং বেদনা প্রকাশের ভিত্তি ও কারণ উভয়ের এক নয়। তবে এই বেদনার অনুভূতির মধ্যেও আনন্দের একটা শিহরণ অনুভব করলাম। সেটা হচ্ছে এই, মৌলবাদ বিরোধীদের এই অনুষ্ঠানও বটমূলে হয়েছে, বটগাছের মগডালে হয়নি। মূলের সাথেই যে মূলধারার অচ্ছেদ্য বন্ধন, তা নানা পার্বনে অমৌলবাদীদের মান্য করতে দেখা যায়, এমনকি কোন কোন রাজনৈতিক দলকেও। এবারও অমৌলবাদীরা বটের মূলে অনুষ্ঠান করেন। আনন্দের আর একটি কারণ ছিল এই, বস্ত্র হরণ সম্ভ্রম হরণ আর পান্তা ভাত গলাধঃকরণের ঘটনা রাজধানীর যে এলাকায় ঘটেছে, সে এলাকার চৌহদ্দীর আশপাশেও ছিল না

www.nagorikpathagar.org

(তাদের ভাষায়) কোন ফতোয়াবাজ, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, আলবদর, রাজাকার, আলেম-ওলামা কেউ। অথচ বস্ত্রহরণ হলো, নারীর সম্ভ্রম হরণ করা হলো, কারা করলেন, এই কৃষ্ণদের পরিচয় কি? বার বার কি তাহলে সেমসাইড?

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা সাধারণ মানুষ জানে না। তাও জানলো প্রায় বছর দিন আগে আর এই পহেলা বৈশাখে। বছর দিন আগের কথা বললাম এ জন্য যে, তখন ভারতীয় শাড়ির বিরুদ্ধে বিএনপি সরকার অভিযান শুরু করেছেন। দোকানে দোকানে তল্লাশী চালাচ্ছেন। সরকারি দলের জনৈক নেতা আবেগে আপ্লুত হয়ে নাকি বলেছিলেন, যাদের পরনে ভারতীয় শাড়ি দেখা যাবে, তাদের শাড়ি খুলে নেয়া হবে। তখন বিরোধী দলীয় এক নেত্রী সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ অভিযান শুরু করবেন না।

পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর সঙ্গে আমাদের মহিলাদের তুলনা করাটা ভাল হলো, না মন্দ হলো, সে বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে সরকার পরনের শাড়ি নিয়ে টানাটানি করেননি। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা সাধারণ মানুষ সে দিন শুনলেন আর দেখলেন ১লা বৈশাখ মোতাবেক ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৪ সালে।

মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গটি এভাবে উল্লেখ আছে। পাশা খেলা চলছে। একদিকে বসলেন শকুনি (দুর্যোধনের মাতুল) আর দুর্যোধনরা একশ' ভাই। অন্যদিকে বসেছিলেন পঞ্চপান্ডব। খেলা শুরু হলো। যুধিষ্ঠির ধন-দৌলত যা এনেছিলেন, সবই হারালেন। ভাইদের বাজি রাখলেন, কিন্তু বাজিতে ভাইদেরও হারালেন। দুর্যোধন বললেন, স্ত্রী তো স্বামীর সম্পত্তি। দ্রৌপদীকে বাজি রাখ। বাজিতে দ্রৌপদী শকুনির হয়ে গেলেন, যুধিষ্ঠির হারলেন। এবার তিনি এবং তার চার ভাই হয়ে গেলেন কৌরবদের দাস এবং তাদের স্ত্রীও হলেন কৌরবদের দাসী। দুর্যোধন সৈনিক পাঠালেন দ্রৌপদীকে নিতে। দ্রৌপদী সব শুনে স্তম্ভিত হলেন, যেতে চাইলেন না। এদিকে দেরী দেখে দুর্যোধন পাঠালেন দুঃশাসনকে। দুঃশাসন গিয়ে চুলের মুঠি ধরে দ্রৌপদীকে টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে গেলেন। দ্রৌপদী এখন ক্রীতদাসী, তার ওপর যা খুশি তা করা যায়। দুঃশাসন রাজ দরবারের সকলের সামনে দ্রৌপদীর শাড়ি খুলতে লাগলেন। দ্রৌপদী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'সভায় মহাবীর ভীম আছেন, আছেন দ্রোণাচার্য, আছেন আমার শ্বশুর

www.nagorikpathagar.org

ধৃতরাষ্ট্র, আছেন রাজা-মহারাজা। আমার স্বামীরা ক্রীতদাস, কাপুরুষ। একজন কুলবধূকে বিবস্ত্র করা হচ্ছে আর এই সব বীরপুরুষরা নীরব! নির্লজ্জ, ভীরু, কাপুরুষের দল! মানুষ নামের অযোগ্য।'

পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। দ্রৌপদীর শাড়ি নাকি ক্রমশ লম্বা হতে লাগলো, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে তার উরু দেখালেন। ভীম হুংকার দিয়ে উঠলেন। দুঃশাসনকে বধ করার শপথ গ্রহণ করলেন আর দ্রৌপদীও বললেন, দুঃশাসনকে হত্যা করে রক্ত মাখা হাতে ভীম আমার বেনী যত দিন না বেধে দেন, ততদিন পর্যন্ত আমি চুল বাঁধবো না।

আমাদের দ্রৌপদীদের বস্ত্র নিয়ে সে দিন দুঃশাসনরা যেভাবে যে এলাকায় টানাটানি করতে থাকেন, সে এলাকায় অনেক পান্ডবও ছিলেন। দ্রৌণাচার্য ছিলেন, হয়তো ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, এমনকি ভীমরাও ছিলেন; কিন্তু কেউ কিছু বললেন না, বাধা দিলেন না, ভীমদের বিক্রমও দেখা গেল না। তাহলে কি সবাই দুঃশাসনের দলে ভিড়েছিলেন? হয়তো কেউ কেউ ছিলেন টানাটানিতে আর কেউ কেউ ছিলেন তামাশা দেখতে? চিন্তা করুন, ভাবুন, তারপর বুকে হাত দিয়ে জবাব দিন- এ সব কি ফতোয়াবাজির ফল, না ফতোয়া না শোনার প্রতিফল? এটা কি নারী নির্যাতন নয়? যদি নারী নির্যাতন হয়, তাহলে এ নির্যাতন কারা করলো? যদি তা নারী নির্যাতন না হয়ে থাকে তাহলে এ সব টানাটানি আর সম্ভ্রম লুণ্ঠন কি বর্ষবরণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত? এ সব করার জন্যই কি ফতোয়ার বিরুদ্ধে এই দুঃশাসনরা এতই ক্ষিপ্ত? ফতোয়া দেয়ার প্রয়োজন তো দেখা দেয় এই দুঃশাসনদের অপকর্মের বিরুদ্ধে। ফতোয়া হয় লিভিং টুগেদার, ডেটিং আর পান্তা ভাত মুখে তুলে দেয়া আর গলাধঃকরণওয়ালা আর ওয়ালীদের বিরুদ্ধে। তবে নব্য দ্রৌপদীদের দেয়াল টপকিয়ে দুঃশাসনদের থেকে বাঁচার কসরত করতে দেখে হাসিও পায়, দুঃখও লাগে। শখ আছে বলেই তো এ সব মেলায় যাওয়া। মেলাতে তো দুর্যোধন আর শকুনি ও দুঃশাসনদের সর্বাধিক আনাগোনা। শখের মেলায় যাওয়ার আগে কি একবারও মনে হয় না যে, দুঃশাসনদের মুষ্টিতে আচল আর কাজল সবই যেতে পারে? বাজারে গেলে অন্যের গায়ে গা লাগবেই, এই চিন্তা-ভাবনা করে বাজারের পথে পা বাড়ানো উচিত। কার ধাওয়ায় ওয়াল টপকালেন, ফতোয়া যারা দেয় তাদের ধাওয়ায়, না ফতোয়া যারা না শুনে তাদের ধাওয়ায়? নাচতে যখন নামেন,

www.nagorikpathagar.org

তখন ঘোমটার কথা চিন্তা না করলেই হয়। যাক তবুও বলি, শাড়ি, কামিজ টানাটানির এসব ঘটনা থেকে নব্য দ্রৌপদীরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন? দুর্যোধনরা তাদের উরু অবশ্যই দেখাবে। এ জন্যই তো তারা ধর্মের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার।

২৭শে এপ্রিলের বিবরণে দৈনিকটিতে লেখা হয়, 'রমনা বটমূলের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যে কলংকময় অধ্যায়ের সূচনা, তা বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেখানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা পাশ্চাত্য সমাজে হয়তো দোষণীয় নয়। কিন্তু আমাদের বাঙালি সমাজে তথা বাঙালি সংস্কৃতিতে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যেভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে কাকরাইল মসজিদের কাছে নববর্ষের অনুষ্ঠানে আগত রিকশা আরোহিনী যুবতীকে অপরিচিত এক যুবক অতর্কিতে তার দুই গালে চুমু দিয়েছিল, তা আমাদের সমাজের সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শুধু আরও লাঞ্ছনার ভয়েই সে দিন সেই যুবতী কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। রমনা বটমূলের মূল অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে যে নাটকের দৃশ্য উন্মোচিত হয়, তার সাথে সভ্য জগতের কোন মিল নেই। যেন একদল হায়েনা তাদের শিকার করায়ত্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে উপস্থিত বধূ-মাতা-কন্যা কেউ নিরাপদ ছিলেন না। যারা তাদের নিরাপত্তা দিতে পারতো, সেই যুব সমাজই তাদের লাঞ্ছিত করেছে। সেখানে শতাধিক নারীর ভয়ার্ত আর্তনাদও সেইসব সারমেয়'র মনে উদ্রেক করেনি সামান্য দয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একজন সম্মানিত শিক্ষক সেদিন স্ত্রী ও তার বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন রমনার বটমূলে। হঠাৎ স্ত্রীর ওপর মানুষরূপী পশুদের হিংস্র আক্রমণ। এর প্রতিবাদ জানালেন শিক্ষক। প্রহৃত হলেন তিনি। ছিনিয়ে নেয়া হলো স্ত্রীর অলংকার। বর্বর হামলার মুখে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারালেন তার বোন। একদিকে ছায়ানটের সঙ্গীতানুষ্ঠান, অন্যদিকে জাসাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মধ্যবর্তী অপরিসর রাস্তার দু'পাশে গজিয়ে ওঠা পান্তার স্টল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে বেরিয়ে আসছেন দর্শক শ্রোতাবৃন্দ। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ শুরু হলো আক্রমণ। সরীসৃপের মত সারা শরীর বেয়ে উঠতে লাগলো নরপশুদের থাবা। অনেককে আত্মরক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টপকাতে হয়েছে পার্কের গ্রীল। এতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে পরিধেয় বস্ত্র।' পরিশেষে লেখক প্রশ্ন রেখেছেন, 'দেশের যুব সমাজের এই অবক্ষয়ের মূল কারণ কি, তা আমাদের তলিয়ে দেখা উচিত। এর জন্য দায়ী কারা?

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয়ই যারা যুব সমাজকে নিজেদের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন, তুলে দেন তাদের হাতে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য উপাদান, তারাই কি মূলত এর জন্য দায়ী নন?' তারপর তিনি আমাদের কর্মের মাধ্যমে যুব সমাজের সামনে সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সুপথে পরিচালিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বলাকা আজাদ নামে যিনি লিখেছেন তিনি লেখক না লেখিকা, হিন্দু না মুসলমান, তা বুঝতে পারিনি, চিনতে পারিনি। চিনতে পারলে বা বুঝতে পারলে আমি সে অনুযায়ী তার কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে পারতাম। তা যখন সম্ভব হলো না, তখন আমি সাধারণভাবে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি। তিনি বলেছেন, নারী-বস্ত্র নিয়ে টানাটানি, যুবতীদের ওপর যুবকদের ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রকাশ্যে চুমু দেয়া পাশ্চাত্য সমাজে হয়তো দোষনীয় নয়, কিন্তু আমাদের সমাজের সাথে কোনভাবেই সাম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি এ মন্তব্য করলেন কিসের উপর ভিত্তি করে এবং কোন্ বই-পুস্তক পড়াশোনা করে, তা আমার বোধগম্য হলো না। আমাদের সমাজ তো পশ্চিমা সমাজকে মডেল বানিয়েছে সর্বক্ষেত্রে, তা এই প্রতিবেদক যে জানেন না, তা জেনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। টেলিভিশনে সাধারণভাবে ডিস এন্টিনার মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত ছায়াছবি এবং ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে এই সমাজের লোক যত সিনেমা বা নষ্টিফস্টি এলেবেলে ছবি ও দৃশ্য দেখে, তাতো পশ্চিমা মন-মানসিকতা রুচি ও চিন্তা দ্বারা তৈরি। যদি এসব এ সমাজের জন্য দোষণীয় হয়ে থাকে, তাহলে তা আমদানি করা হয় কেন? ডিস এন্টিনা কেন চালু করা হলো, এই ধাঁচে কেন আমাদের দেশে ছায়াছবি নির্মিত হচ্ছে? টেলিভিশনের নাটকে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে পাশ্চাত্য প্রেমের নগ্ন অনুশীলন কেন হয়ে থাকে? চুমুর দৃশ্যতো হরহামেশা এই সমাজের লোক দেখছে। আপনিও চলার পথে দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা সিনেমার পোস্টার-বিজ্ঞাপনে প্রচণ্ড কড়া চুমুর দৃশ্য শতাধিক প্রত্যহ দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন। সবখানে যদি এ সব চলতে পারে, তাহলে বটমূলে তা কেন চলবে না শুনি? সারা বছর যা আমাদের জন্য সামঞ্জস্যশীল থাকে, তা কেন বছরের একটি দিনে অসামঞ্জস্যশীল ভাবতে পারেন? বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলছেন? এই সংস্কৃতিতে সতী-সাধ্বীদেরও বস্ত্র খোলা হয়, যারা বটমূলে গিয়েছে, তারা ঐ বাঙালি সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকার। আপনি বলছেন, অনুষ্ঠানের

www.nagorikpathagar.org

সমাপ্তিতে যে নাটকের দৃশ্য উন্মোচিত হলো, তার সাথে সভ্য জগতের কোন মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের কাছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সভ্য জগতের দেশগুলো হলো- আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি প্রভৃতি। এসব 'সভ্য দেশের' সঙ্গে বটমূলের ঝাপটাঝাপটির অপূর্ব মিল আছে তা আপনি জানেন না। যারা এই সভ্যতার সংস্কৃতির দ্রৌপদীর ওপর হামলা করেছে তাদের আপনি সারমেয় অর্থাৎ কুকুর বলছেন। ছিঃ ছিঃ, এমন কথা বলবেন না। তারা আপনাদের লাইফ ব্লাড, ঘাদানির মূল শক্তি, ইসলাম ও আলেম-ওলামা বিরোধী শক্তির এরা আর্টিলারি ফোর্স, কোন কোন দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এরা হর্স-পাওয়ার। এদের অন্তত কুকুর গালি দেয়া এই শ্রেণীর পত্রপত্রিকার পক্ষে শোভা পায় না।

ঢাকা রমনা পার্কে সংঘটিত হাজারো ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে ছিল এটি একটি ঘটনা মাত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও ঘটেছে অনেক কিছু, যার মধ্যে রাজশাহী শহরের ঘটনাটির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। রাজশাহীতে নববর্ষের প্রথম দিন ঘটেছে তরুণ-তরুণীদের অর্ধ উলঙ্গভাবে পথ পরিক্রমন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে একদল তরুণ-তরুণী দৃষ্টিকটু পোশাক ও বেলাল্লাপনা ভঙ্গিতে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় সে দিন ঘুরে বেড়ায়। সাংস্কৃতিক জোটের নামে আরেকটি গ্রুপ বিভিন্ন বন্য জন্তুর মুখোশ পরে উদ্দাম নৃত্য করে। তারা নতুন সূর্যকে স্বাগতম জানাতে পদ্মা নদীতে যায় এবং গণস্নান করে। তারা মঙ্গল প্রদীপ মিছিলও করে।

শেষ কথা, আপনার কানে কানে বলে রাখছি পাদটীকা হিসেবে, তা হচ্ছে এই- এই কুকুর আর কুকুরীদের মানুষ করার জন্যই তা ফতোয়ার দরকার। অথচ ধর্মের কথা শুনলেই আপনারা বলেন, ফতোয়াবাজি। যারা সে দিন বটতলায় গিয়ে বস্ত্রহরণ আর সম্ভ্রম হরণের শিকার হয়, যদি তাদের লাজ-লজ্জা কিছু থাকে, তাহলে অনুরোধ থাকলো, তারা যেন আর বটতলায় না যান। শেষ মিনতি, বটতলায় আর যেও না সখীরা, যদি থাকে লাজ।

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজি নববর্ষ বরণ

[নিজের যা কিছু আছে তা যখন বর্জন করেছি, তখন পরের হিসাব অনুযায়ী আমরা হিসাব কষবো, পরের সাল, মাস ও বার অনুসরণ করে নিজেদের কাজকর্ম করবো, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে এই বর্ষকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে রাত ১২-০১ মিনিট থেকে ভোর পর্যন্ত উন্মাতাল হয়ে নাচতে হবে, রাজপথে মিছিল করতে হবে, পটকা ফুটাতে হবে, নগ্ন হয়ে যুবক-যুবতীদের রাজপথে উল্লফন নৃত্য করতে হবে, তাও মুসলমান নামের যুবক-যুবতীরা, এ কেমন কথা? কোন্ যুক্তিতে এমন বেসামাল অনুষ্ঠান করা হয়? নগরবাসীর রাতের ঘুমকে হারাম করা হয়? নাদান বোকা আর আহাম্মকের বাড়াবাড়ি না হয় একটু বেশি হয়ে থাকে। আহাম্মক মূর্খ ও বোকারা হাসে অন্যকে হাসতে দেখে। কারণ, জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওরা যে হাসছে তাই হাসছি। ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে সে রাতে যারা রাজপথে এত মাতামাতি, দাপাদাপি করে, তারা কি বোকা, আহাম্মক, নাদান, মূর্খ? মোটেই না। তারা শিক্ষিত ও শিক্ষিতা। আক্কেল-বুদ্ধির ভান্ডার নিয়ে তারা ঘুরে, চলাফেরা করে। তারা কেন ইংরেজি নববর্ষ বরণ করতে গিয়ে এত লাফালাফি করে? এর কারণ হতে পারে আমার মতে প্রধানত দু'টি, একটি হচ্ছে এই, আসলে তারা ইংরেজি মাস বারের ইতিহাসই জানে না। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে এই, যদিও বা কিছুটা জানে তবুও জানা থাকা সত্ত্বেও আত্মবিক্রিত চরিত্রের মানুষগুলো পরকীয়া সংস্কৃতির এমনভাবে সেবাদাস আর দাসী হয়েছে যে, স্বকীয়তার বিস্মরণ আর পরকীয়া সংস্কৃতির বরণকে তারা জীবনের লক্ষ্যে বানিয়েছে। এছাড়া অন্য কোন কারণে তারা এমন করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বর দিবাগত রাতে এই রাজধানী ঢাকায় যারা রাত কাটান, তারা রাজধানীর স্থায়ী না অস্থায়ী না মোসাফের বাসিন্দা, সেটা বড় কথা নয়, আমার জিজ্ঞাসা, ঐ রাত ১২টার পর কেউ কি ঘুমাতে পারেন? বৃদ্ধরা তো নয়ই, শিশুরাও নয়। যুবকদের মধ্যে যারা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী, বালিশে মাথা রাখলেই গভীর ঘুম আসে, তারাও কি ঘুমাতে পারেন? আমার মনে হয় কেউ ঘুমাতে পারেন না। না শিশু, না বৃদ্ধ, না যুবক। কেন পারেন না? পারেন না এ কারণে যে, রাজধানীর সর্বত্র, অলিগলি রাজপথে রাত ১২টা বাজার আগে থেকে উষা পর্যন্ত হাজার হাজার বোমা ফাটে কামানের গোলা ছোঁড়ার মত শব্দ করে, এ অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে ঘুমানো কি সম্ভব? সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কুম্ভকর্ণের জাত-বংশের কেউ বেঁচে থাকলে তারও ঘুম ভাঙতো। ইংরেজি নববর্ষের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে মুসলিম নামধারী বিভিন্ন বয়সের এক শ্রেণীর নরনারী (নর মেজোরিটি আর নারী মাইনোরিটি) সারা রাত বিভিন্ন রাস্তায় ও বাসার ছাদে উঠে কি কি করেন, তা সভ্য লোকের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমার একটি প্রশ্ন, যারা এমন করেন, তারা তো লেখাপড়া জানা লোক, ওরা কি ইংরেজি মাস ও বারের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত জানেন না? না জেনে না শুনেই কি এত লাফালাফি তারা করে থাকেন? ১লা জানুয়ারি রাতে যারা বোমা ফাটান, লাফালাফি করেন, ১লা বৈশাখে গাছ তলায় বা উদ্যানে বসে পরনারীর হাতে পান্তা ভাত গিলেন, তাদের কি হলো?

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইংরেজি সাল, মাস ও বার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সাল, মাস ও বার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও নানা কাজকর্মে। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেও এ গণনা বা হিসাব অনেক দেশেই প্রচলিত। আমরা বাংলাদেশীরাও তা ব্যবহার করে থাকি অন্যান্য দেশের মত। কারণ, নিজের যা কিছু আছে তা যখন বর্জন করেছি, তখন পরের হিসাব অনুযায়ী আমরা হিসাব কষবো, পরের সাল, মাস ও বার অনুসরণ করে নিজেদের কাজকর্ম করবো, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে এই বর্ষকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে রাত ১২-০১ মিনিট থেকে ভোর পর্যন্ত উন্মাতাল হয়ে নাচতে হবে, রাজপথে মিছিল করতে হবে, পটকা ফুটাতে হবে, নগ্ন হয়ে যুবক-যুবতীদের রাজপথে উল্লম্ফন নৃত্য করতে হবে, তাও মুসলমান নামের যুবক-যুবতীরা, এ কেমন কথা? কোন্ যুক্তিতে এমন বেসামাল অনুষ্ঠান করা হয়? নগরবাসীর রাতের ঘুমকে হারাম করা হয়? নাদান

www.nagorikpathagar.org

বোকা আর আহাম্মকের বাড়াবাড়ি না হয় একটু বেশি হয়ে থাকে। আহাম্মক মূর্খ ও বোকারা হাসে অন্যকে হাসতে দেখে। কারণ, জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওরা যে হাসছে তাই হাসছি। ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে সে রাতে যারা রাজপথে এত মাতামাতি, দাপাদাপি করে, তারা কি বোকা, আহাম্মক, নাদান, মূর্খ? মোটেই না। তারা শিক্ষিত ও শিক্ষিতা। আক্কেল-বুদ্ধির ভান্ডার নিয়ে তারা ঘুরে, চলাফেরা করে। তারা কেন ইংরেজি নববর্ষ বরণ করতে গিয়ে এত লাফালাফি করে? এর কারণ হতে পারে আমার মতে প্রধানত দু'টি, একটি হচ্ছে এই, আসলে তারা ইংরেজি মাস বারের ইতিহাসই জানে না। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে এই, যদিও বা কিছুটা জানে তবুও জানা থাকা সত্ত্বেও আত্মবিক্রিত চরিত্রের মানুষগুলো পরকীয়া সংস্কৃতির এমনভাবে সেবাদাস আর দাসী হয়েছে যে, স্বকীয়তার বিস্মরণ আর পরকীয়া সংস্কৃতির বরণকে তারা জীবনের লক্ষ্যে বানিয়েছে। এছাড়া অন্য কোন কারণে তারা এমন করতে পারে না।

বিবেক ও চরিত্র বিক্রিতদের জানা আছে কিনা, তা জানি না, ইংরেজি মাস ও বারের নামে ও ব্যবহারে তাদেরই কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, মিথোলজি পরিপূর্ণভাবে বিধৃত। তারা যদি তাদের বর্ষবরণ করতে গিয়ে নাচে-গানে উন্মাতাল হয়, তাহলে তারা উন্মাতাল হতে পারেন। কারণ, এ সব তাদের কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাতো আমরা করতে পারি না। এ আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিধিভুক্ত নয়। এ সত্যকে আমাদের আহাম্মকরা যদি বুঝতো, তাহলে রাজপথে এত নাচানাচি করতো না এবং রাজধানীর বাসিন্দাদের রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতো না, মদ্যপান করে নগ্ন নৃত্যও করতো না। ইংরেজি মাস ও বারের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তও তারা জানে না বলে বোধহয় ইংরেজি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে এত লাফায়।

একটি ভূমিকাসহ সে ইতিহাস আলোচনা করি। অনেক বয়োবৃদ্ধ সুধী এখনও ইংরেজের ইতিহাস স্মৃতিচারণ করে বলেন, প্রায় দুই শতাব্দী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায়নি। এ কথার ব্যাখ্যা করে তারা বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধব্যাপী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত। সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশে যখন সূর্য অস্ত যেত, তখনই একই সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য দেশে সূর্যোদয় হত। এমনকি এক দেশে অস্ত যাওয়ার আগেই কোন কোন দেশে সূর্যোদয় হত। এত বিশাল ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্তের কোন প্রশ্নই তখন ওঠেনি।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য থাকতো ২৪ ঘণ্টা। এভাবে বললে রাতের কথাও বলা যায়। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা রাত্র ও ২৪ ঘণ্টা দিন বিরাজ করতো যে সাম্রাজ্যে, তারই নাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

যে সব সুধী এমন ব্যাখ্যা দেন, তাদের ব্যাখ্যা যে বিলকুল সঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি তাদের এ ব্যাখ্যাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়েই বলি, এ ব্যাখ্যা তো অবশ্যই সঠিক ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক দিয়ে আর তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সাফল্যের কারণে, কিন্তু যে ব্যাখ্যা এই সুধীরা দিয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমার একটি আবেদন হচ্ছে জিজ্ঞাসার আকারে, আর সেটা হচ্ছে এই, এককালে তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না এ কথা ঠিক, কিন্তু একালেও তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাসের সূর্য অস্ত যায় না, তা কি লক্ষ্য করেছেন? শিক্ষা সম্পর্কেই প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করি, অতঃপর আসি মূল প্রসঙ্গে। উইলিয়াম বেন্টিকের সময় একটা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় লর্ড মেকলের ওপর। উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে কোন্ লক্ষ্যে এবং কিভাবে শিক্ষিত করে তুললে তারা খুশি হবে এবং ইংরেজ কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুযায়ী তাদের মন-মেজাজ, লেবাস, চরিত্র গঠিত হবে। লর্ড মেকলে সেভাবে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন ভারতবাসীর জন্য। তিনি তাঁর রিপোর্টের মধ্যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, We must do our best to form a class of people, those who will be Indians in blood and colour, but ultimately they will be Britishers in moral and in character. অর্থাৎ এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো যাতে ভারতবাসী রক্তে ও বর্ণে ভারতবাসী থাকলেও তারা অবশেষে হবে ব্রিটিশ মানসিকতা ও চরিত্রের মানুষ।

আমার প্রশ্ন, ব্রিটিশরা কি এই ফলাফলই পায়নি? রক্ত ও বর্ণের ভারতবাসীর অনেকেই কি (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) ব্রিটিশ মানসিকতা ও চরিত্রের মানুষ হয়নি? এর বিপরীত ফল ভোগ কি এখন আমরা করছি না? যদি তা সঠিক বলে মেনে নেই, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটিশ শিক্ষার সূর্যটা আজো অস্ত যায়নি এবং কখনো যাবে বলেও মনে হয় না।

এবার আমরা আসি কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে বোধ হয় বিস্তারিত আলোচনার তো প্রয়োজনই নেই, এমনকি সংক্ষিপ্ত

www.nagorikpathagar.org

আলোচনারও প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে, আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, আহার-নিদ্রায়, সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে, ছেলেমেয়ের নামকরণে, জন্মদিন পালনে, নিজ নিজ দেহের লেবাসে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মধ্যদিয়ে কি আমরা এ প্রমাণ রাখছি না যে, হে ইংরেজ জাতি, তোমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সূর্যটা আজও আমাদের মনোরাজ্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেদীপ্যমান, এ কখনো অস্ত যাবে না, আমাদের মনের মধ্যাহ্ন গগনে তা বিরাজ করবেই।

যা বললাম, তা কি ঠিক নয়? চাচা-চাচি, মা-বাবা ডাক তো ছেড়ে দিয়ে আংকেল, আন্টি, মাম্মি, ডাড্ডি ধরেছি। ৮ই ফাল্গুন বাদ দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করছি। এসব কি প্রমাণ করে না যে, ব্রিটিশের কালচার-সংস্কৃতির সূর্যটা এখনও আমাদের চিন্তা-রাজ্যে সর্বদা আলো বিতরণ করছে। আর আমরা সে আলোয় অবগাহন করছি।

আসুন, ইংরেজের মাস ও বারের দিকেই তাকাই, তাঁদের ইতিহাস আলোচনা করি, কিছুটা হলেও উপলব্ধিতে আনি, তাহলে দেখবো, তাদের মাসের নামে আর বারের নামে তাদেরই কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, মিথোলজি বে-নেকাব উপস্থিত। এ জন্য তারা সাম্প্রদায়িক আখ্যা পায় না, ধর্মান্ধ হয় না, সেকেলে অপবাদ পায় না, মৌলবাদী বলে গালিও শোনে না। তাদেরই পূর্ব-পুরুষের দেবতার নাম আমরা সর্বক্ষণ নিচ্ছি, তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে আমরা পালন করছি। তাইতো ইংরেজি নববর্ষ পালনে এত উন্মাতাল হয়ে যাই। নিজেরটা পান্তা ভাতে আর কাঁচা-মরিচে মাটির খুরায় সাজিয়ে ইংরেজি কায়দায় গলাধঃকরণ করি আর নিজের নববর্ষ (মহরম) ধর্মীয় লেবাসে ঢেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে একটু মাত্র নাড়াচাড়া করি অথচ ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে মহানন্দে উল্লাস করি, নগরবাসীর রাতে ঘুমকে হারাম করি এবং আরো কত কিছু করি।

ইংরেজদের রচিত বিভিন্ন ইতিহাস এবং বিশ্বকোষ ঘাঁটাঘাঁটি করলে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, ইংরেজি মাস ও বারের মধ্যে আমাদের জন্য এমন কি আছে যা নিয়ে বেহদ্দ বাড়াবাড়ি করি। আমি এখানে ইতিহাস থেকে এ সংক্রান্ত তথা সংগ্রহ করে, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপেডিয়া এবং এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ইংরেজি মাস ও বারের আলোচনা করছি, তাতে দেখা যাবে এবং এ সত্য প্রমাণিত হবে যে, আমরা কোন্

www.nagorikpathagar.org

মিথোলজির পিছনে ধাবিত হচ্ছি এবং বিনিময়ে কি পাচ্ছি, মুসলিম তরুণ-তরুণীদের তা জানা উচিত।

জানুয়ারি মাস : জানুয়ারি বর্তমান বর্ষপঞ্জিতে ইংরেজি সালের প্রথম মাস। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৭০০ বছর আগে রোমের শাসক নুমা পম্পিলিয়াস (Numa Pompilius) জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসকে রোমান ক্যালেন্ডারের দশম মাসের শেষ দিকে সংযোজন করেন। তিনি জানুয়ারি মাসকে ৩০ দিনের মাস করেন। খ্রিস্ট পূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar) জানুয়ারি মাসে একদিন যোগ করে বছরের প্রথম মাস হিসেবে চালু করেন। রোমের নর্স উপজাতিরা (Norse) বছরের প্রথম মাসকে থর (Thor) বলতো। কারণ, থর ছিল তাদের দেবতা। ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দেবতা। এ্যাংলো সেক্সনরা এ মাসকে ওলফ মাস বলতো। কারণ, ওলফ মানে নেকড়ে বাঘ। শীতকালে নেকড়ে বাঘরা দল বেঁধে গ্রামে আসতো খাদ্য তালাশের জন্য।

জানুয়ারি মাসের নামকরণ হয়েছে রোমান দেবতা জেনাসের (Janus) নামানুসারে। এ সম্পর্কে রোমান উপখ্যান হচ্ছে এই, অতি প্রাচীনকালে রোমে জেনাস নামে একজন পৌরাণিক সম্রাট ছিলেন, তিনি এত পরোপকারী ছিলেন যে, লোকে তাকে দেবতার আসন দেয়। তিনি যুদ্ধ-কলহ মোটেই পছন্দ করতেন না। এ জন্য তাঁকে শান্তির দেবতাও বলা হতো। রোমান পূরাণের উপাখ্যান হচ্ছে এই, তিনি নাকি সামনে-পিছনে, ডানে-বামেও দেখতেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি ছিলেন খুবই দূরদর্শী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা অর্থাৎ ভক্তেরা তাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে থাকে। তিনি হয়ে যান রোমবাসীর কাছে এক দেবতা। এই জেনাসের নামে বছরের প্রথম মাসের উদ্বোধন করা হয় জানুডিয়াস নামে। পরে ইংরেজিকরণে হয় জানুয়ারি।

ফেব্রুয়ারি মাস : গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের (Gregorian calendar) দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারি। রোমের প্রথম ক্যালেন্ডারে ছিল ১০টি মাস। নুমা পম্পিলিয়াস ক্যালেন্ডারে আরো দু'টি মাস যোগ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসকে তিনি দেন দ্বাদশ স্থান। ফেব্রুয়ারি নামটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Februare থেকে। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র করা, শোধন করা, খাদমুক্ত করা। রোমানরা তাদের ক্যালেন্ডারের দ্বাদশ মাসে নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত-পবিত্র করতো বছরের প্রথম মাসের উৎসবে যোগ্য করে তোলার জন্য। খ্রিস্ট পূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সীজার

www.nagorikpathagar.org

ফেব্রুয়ারিকে বছরের দ্বিতীয় মাসে স্থান দেন। প্রথমে ফেব্রুয়ারি মাস ছিল ৩০ দিনে। জুলিয়াস সীজারই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দু'দিন নিয়ে ১ দিন যোগ করেন জুলাই মাসে আর একদিন যোগ করেন আগস্ট মাসে। ফলে ফেব্রুয়ারি মাস হয়ে যায় ২৮ দিনের মাস।

অন্য একটি উপাখ্যানে আছে ল্যাটিন 'ফেব্রুয়ারি' শব্দ থেকে এসেছে ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়া অর্থ হচ্ছে জরিমানা বা পাপের দণ্ড। অপরাধীদের এ মাসে জরিমানা ও নানা শাস্তি দিয়ে শুদ্ধ করা হতো। ইংরেজিকরণে এ নাম হয়েছে ফেব্রুয়ারি।

মার্চ মাস : মার্চ মাস হচ্ছে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস। প্রাচীন রোমের ক্যালেন্ডারে এই মাসটি ছিল বছরের প্রথম মাস। এ জন্য একে বলা হতো মারটিয়াস (Martius)। সীজার এই মাসকে তৃতীয় মাসে স্থান দেন। রোমান যুদ্ধের দেবতার নাম হচ্ছে মার্স (Mars)। এই দেবতার নামানুসারে মার্চ মাসের নামকরণ হয়। এই মাস মারটিয়াস হিসেবে চালু ছিল বছরের প্রথম মাস হিসেবে। প্রথম মাস হিসেবে চালু করার তাৎপর্য ছিল এই, মারটিয়াস মানে অভিযান করা, শুরু করা। রোমরা এ সময় অভিযান শুরু করতো। সে কারণে এর নাম দেয়া হয় অভিযানের মাস। আর এক ইতিহাসে আছে, খ্রিস্ট পূর্ব ৭৫৩ অব্দে রমুলাস সৌর শশীমানের পরিবর্তে শুধু শশীমান গণনা আরম্ভ করে এই নাম দেন। কনস্টাইনটাইনের আমলে ইংরেজিকরণে নাম হয় মিয়ার্স (Mearc)। আধুনিকীকরণে হয় মার্চ। শব্দের অর্থও অভিযান। নিউমারের আমলে ১০ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসে বছর ধরে এর স্থান হয় দ্বিতীয়, অতপর ফেব্রুয়ারি এর স্থান দখল করায় ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে এর স্থান তৃতীয়তে রাখা হয়।

এপ্রিল মাস : রোমানরা এ মাসকে বলতো এপ্রেলিস (Aprelis), এই রোমান নামের অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত করা। কোন কোন ইতিহাস গবেষক বলেন, গ্রীক নাম এপরোডাইট (Aphrodite) থেকে এপ্রিল নামের উৎপত্তি। এপরোডাইট হচ্ছে গ্রীসের প্রেম দেবতার নাম। প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে এ মাস ছিল দ্বিতীয় মাস। জুলিয়াস সীজারই খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে চতুর্থ মাস হিসেবে যুক্ত করেন। ইতিহাসে আরও উল্লেখ আছে, খ্রিস্ট পূর্ব ৭৫৩ অব্দে সংখ্যাভিত্তিক দ্বিতীয় মাস ডুয়াসের একবিংশ দিনে রোমাকোরাডেটা মহানগরীর পত্তন করে রুমুলাস এই মাসের নাম দেন এপ্রিলিস অর্থাৎ উদ্বোধন। দু'কারণে এ নামের স্বার্থকতা। একটি হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

মহানগরীর উদ্বোধন, অন্যটি এ সময়ে প্রকৃতি নব পল্লবে পল্লবিত হয়। বলাবাহুল্য, এপ্রেলিস বা Apeire (বৃটেনিকায় এ নাম রয়েছে) ইংরেজিকরণে এপ্রিল হয়। ইংরেজি বছরের চতুর্থ মাস এই এপ্রিল।

মে মাস : প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে এটি ছিল বছরের তৃতীয় মাস। প্রথম মাস ছিল মার্চ। জুলিয়াস সীজার তা পরিবর্তন করে জানুয়ারিকে প্রথমে আনেন এবং মে মাসকে পঞ্চম স্থান দেন। সেই থেকে মে মাসের অবস্থান পঞ্চম স্থানেই আছে। রোমান দেবীর নাম মায়া (Maia)। এ দেবী বসন্ত ও সতেজতা এবং সমৃদ্ধির দেবী। তার নামানুসারে মে-এর নামকরণ। অন্য মত হচ্ছে, মে শব্দটি এসেছে Majores শব্দ থেকে। এই ল্যাটিন শব্দের অর্থ হলো 'বয়স্কলোক'। কারণ এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মে মাস অর্থাৎ এই সময়টা বয়স্কদের জন্য প্রিয়।

জুন মাস : প্রথমে মাসটি ছিল ২৯ দিনের। জুলিয়াস সীজার এ মাসকে ৬ষ্ঠ মাসে স্থান দেন। রোমান দেবতা জুনো (Juno) বিবাহের পৃষ্ঠপোষক দেবী। তারই নামানুসারে জুন মাসের নামকরণ। অন্য অভিমত হচ্ছে, এই জুনো নামটি নেয়া হয়েছে জুনিয়র শব্দ থেকে। জুনো আর জুনিয়র এক অর্থবোধক শব্দ। Juno হচ্ছে জুপিটারের ভার্য্যা।

জুলাই মাস : প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে জুলাই ছিল পঞ্চম মাস। রোমানরা বলতো কুইনটিলিজ (Quintilis), যার অর্থ পঞ্চম। জুলিয়াস সীজার এ মাসেই জন্মগ্রহণ করেন। জুলিয়াসের সম্মানে রোমান সিনেট এ মাসের নাম রাখে জুলিয়াসের মাস। প্রথম ছিল অর্থাৎ রুমুলাসের আমলে পঞ্চম মাস, নিউমার আমলে ষষ্ঠ মাস, পরবর্তীতে সপ্তম মাসে স্থান দেয়া হয়। বর্তমানেও জুলিয়াস মাস ইংরেজিকরণ হয়ে জুলাই মাস হিসেবে প্রচলিত। সীজারের আমল থেকেই জুলাই মাসকে ৩১ দিনের মাস করা হয়।

আগস্ট মাস : রোমানরা এ মাসকে বলতো সেক্সটিলিজ মাস (Sextilis), এর অর্থ হচ্ছে ষষ্ঠ। পরবর্তী সময়ে সম্রাট অগাস্টাসের সম্মানে নাম পরিবর্তন করা হয়। রোমান সিনেট নামকরণ করে অগাস্ট। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১ দিন নিয়ে মাসটিকে ৩১ দিন করা হয়। এ সম্পর্কে প্রায় কাছাকাছি অভিমত হচ্ছে এই, রোমীয় পৌরাণিক সংখ্যাভিত্তিক সেকসাস মাসের ল্যাটিন নামকরণ হয় আগস্টাস।

www.nagorikpathagar.org

অগাস্টাস খ্রিস্টপূর্ব ৩৬ অব্দে রোমের তিনাই শাসন পরিষদের সদস্য হোন এবং গৃহযুদ্ধ মিটিয়ে যুদ্ধ জর্জরিত রোমকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

সেপ্টেম্বর মাস : রোমান ক্যালেন্ডারে প্রথমে সেপ্টেম্বর মাসটি ছিল সপ্তম মাস। জুলিয়াস সীজার এ মাসকে নবম স্থানে নেন। সেপ্টেম্বর নামটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ সেপটেম (Septem) থেকে, যার অর্থ হলো সপ্তম।

অক্টোবর মাস : অক্টোবর শব্দটি এসেছে ল্যাটিন একটি শব্দ অক্টম থেকে, যার অর্থ 'আট'। প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে মাসটি অষ্টম স্থানে ছিল। সীজার একে খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে দশম স্থান দেন। সে সময় থেকে মাসটি দশম মাস হিসেবে প্রচলিত। ইংরেজিকরণে অক্টম হয়ে যায় অক্টোবর।

নভেম্বর মাস : ল্যাটিন নভেম (NOVEM) শব্দ থেকে নভেম্বরের উৎপত্তি। নভেম অর্থই হলো নবম। রোমান ক্যালেন্ডারে এ মাস প্রথমে নবম মাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রোমান সিনেট টাইবারিয়াস সীজারের সম্মানে তার নামানুসারে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে আপত্তি তোলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন ১১তম রোমের সম্রাট। সে কারণে মাসটিকে ক্যালেন্ডারে ১১তম স্থান দেয়া হয়।

ডিসেম্বর মাস : ল্যাটিন শব্দ ডিসেম (Decem) থেকে ডিসেম্বর শব্দের উৎপত্তি। ডিসেম অর্থ দশ। প্রথমে রোমান ক্যালেন্ডারে মাসটি দশম স্থান হিসেবে ছিল এবং ২৯ দিনে মাস ছিল। পরে জুলিয়াস সীজার একে ১২তম মাসে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দুটি দিন যোগ করেন।

এই তো গেল মাসের নামের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এবার দেখা যাক বারের উৎপত্তি-পরিচিতি কি।

ফ্রাইডে : এ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ ফ্রিংগডেগ (Frigedaeg) থেকে উদ্ভব। যার অর্থ হলো ফ্রিগ-এর দিন। ফ্রিগ (Frigg) ছিল নর্স মিথোলজিতে উল্লেখিত প্রেম দেবতা।

সেটারডে : সেটারডে হচ্ছে এ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ Saeter-Daeg-এর ইংরেজিকরণ রূপ।

স্যাটারডে-এর অর্থ হলো সপ্তাহের সপ্তম দিন। রোমান দেবতা Saturn-এর

www.nagorikpathagar.org

নামানুসারে সেটারডে নামকরণ হয়। স্যাটার্ন হচ্ছে সর্ব বৃহৎ গ্রহেরও নাম। Saturn ছিল রোমের প্রাচীন দেবতা। সে ছিল OPS দেবীর স্বামী। স্যাটার দেবতাকে বলা হতো উর্বরতা ও ফসলের দেবতা।

সানডে : সানডে হচ্ছে টিউটনিক (Teutonic) জাতির পবিত্র দিন। নামটি নেয়া হয় SUN বা সূর্য থেকে। ফরাসিরা রোববারকে বলে DIMANCHE. স্পেনিশরা বলে DOMINGO. ইতালীরা বলে DOMENICA. এই তিনটি নামেরই উদ্ভব ঘটে ল্যাটিন শব্দ DIES DOMINICA শব্দ থেকে। যার অর্থ লর্ড-এর ডে। ৩০০ খ্রিস্টাব্দে চার্চ এবং রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় রোববার অর্থাৎ Sunday হবে অবকাশ যাপনের দিন।

মনডে : মনডে শব্দের উৎপত্তি এ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ Monandaeg শব্দ থেকে। এর অর্থ হলো Moon's day অর্থাৎ চন্দ্রের দিন। চন্দ্র দেবতার সাথে এই দিনটির নামকরণ। প্রাচীনকালে প্রত্যেকটি দিন কোন না কোন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত ছিল।

টুইসডে এবং উয়েডনেস ডে : টুইসডে (মঙ্গলবার) এসেছে (TIUORTIW) শব্দ থেকে, এ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ Tyr শব্দের একটি রূপ মাত্র। নার-এর নর্স দেবতার নামও Tyr. Tyr ছিল odin অথবা উডেন (Woden) -এর ছেলে। এই উডেনের নামানুসারেই উয়েডনেসডে নামকরণ হয়। ফরাসিরা টুইসডেকে বলে MARDI মাস (MARS) দেবতা বা গ্রহের নামেও এই বার। উয়েডনেসডে ছিল সপ্তাহের চতুর্থ দিন। শুরুতে নাম ছিল WEHNZ Dee বা WEHNZ ডে। দিনটিকে গণনা করা হতো সপ্তাহের চতুর্থ দিন হিসেবে। আগেই বলা হয়েছে দিনটি Woden বা Odin নামানুসারে করা হয়েছে। খ্রিস্টান সাল শুরুর আগে জার্মানরা দিনটিকে Woodens day বলতো। পরে তারা Wednesday বলতে শুরু করে। রোমান মিথোলজি অনুযায়ী দিবসটির সংযোগ রয়েছে গড মারকুরীর সঙ্গে।

থার্সডে : থার্সডে নামকরণ হয়েছে টিউটনিকের থান্ডার গড-এর নামানুসারে। Thor -দের জন্য দিবসটি ছিল পবিত্র। এ জন্য তারা থরডেও বলতো। পণ্ডিতদের অভিমত This is Probably a translation of the Latindies Jovis

www.nagorikpathagar.org

macaning Jove's day for Love or Jupiter the Roman god of thunder. দেবতাশ্রয়ী এই নামও।

ইংরেজি মাসের নাম ও বার বিশ্বব্যাপী গৃহীত এবং ব্যবহৃত। লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, দেব-দেবীর নামের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের নামানুসারে সৃষ্ট নাম আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে, উচ্চারণ করতে হচ্ছে হরদম। ইংরেজরা রোমান ক্যালেন্ডারকে তাদের ঐতিহ্যে গড়ে তোলে বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ জন্যই বলেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এখন রাজনৈতিক সূর্যের অস্ত গেলেও তাদের কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক সূর্যের অস্ত যায় নি। আমাদের তরুণরা যদি তা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলে ইংরেজি নববর্ষে উন্মাতাল হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। এ উদ্দেশ্যেই এই রচনা আর ইতিহাস তুলে ধরা হলো। এতে কি মুসলমানদের আনন্দ করার মত কিছু আছে?

একটি জাতির তাজা প্রাণশক্তি বলতে বুঝায় সেই জাতির যুবক শ্রেণীকে। বয়সের দিক থেকে তাদের অবস্থান মধ্যগগনে। দৈহিক গঠনের দিক থেকেও এই বয়সে পূর্ণতা ঘটে। এর স্থিতিকাল থাকে মাত্র কয়েক বছর। তার পর শুরু হয় জীবনের অবশিষ্ট মেয়াদের ক্রমশ হ্রাস। যৌবনের তেজ আর বিক্রম ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করে। অতপর জীবনের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এর ইতি ঘটে। সুতরাং জীবনটা যখন মধ্য গগনে থাকে অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় থাকে তখন উপলব্ধি, শক্তি, সচেতনতাবোধ ও জাতির প্রতি ভালবাসার গভীরতা থাকে প্রগাঢ় এবং সক্রিয়। এ সময়টা যেমন জ্ঞান আহরণের, তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি, সভ্যতা, মান, মর্যাদাকে পাহারা দেয়ারও উপযুক্ত সময়। জাতির সত্যিকারের আর্টিলারী ফোর্স এই যুবক শ্রেণী। যেমন তারা মুকাবিলায় দুর্বার তেমনি আত্মরক্ষায়ও দক্ষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুবক শ্রেণী নিজ নিজ জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক প্রতিরক্ষায় দুর্বার ও দুর্জয় যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করে নিজ নিজ জাতিকে রক্ষা করেছে এবং শত্রুর হামলা প্রতিহত করে জাতিকে সব রকমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে সেই তেজ ও বিক্রমে ভাটা পড়তে দেখা যাচ্ছে। ঠিক ভাটা বলবো না, তেজ বিক্রম ঠিকই আছে তবে ভিন্ন খাতে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারায় প্রবহমান। কথাটাকে সহজভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, এখন যে উল্লাস উদ্যোম আমরা দেখছি বিজাতীয় সংস্কৃতি ও

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতার বন্দনা ও জয়গানে, তার অভিব্যক্তি ঘটা উচিত ছিল নিজস্ব তাহজীব তমদ্দুন সভ্যতা সংস্কৃতি-বন্দনা ও বরণে এবং বাস্তবায়নে অনুশীলনে। পরকীয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়ানো উচিত ছিল সীসা ঢালা প্রাচীরের মত আর হুংকার ছাড়া উচিত ছিল সিংহ বিক্রমে। কিন্তু হায়! একি দেখছি? রোমান গ্রীক দেবদেবীর বন্দনায় আর বরণ অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে সারা রাত কাটাতে দেখি শীতের রাতে নানা রং ঢং করে। অভিজ্ঞজনরা বলেন, খ্রিস্টান দেশেও ৩১শে ডিসেম্বরের দিবাগত রাতে এমন হতে দেখা যায় না, যা দেখা যায় মসজিদ নগরী এই রাজধানী ঢাকাতে যা একটি মুসলিম দেশের প্রাণকেন্দ্র।

নতুন করে বলার কিছু নেই, উপদেশ দানেরও ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না, ইতিহাসে যা উল্লেখ আছে তা আমি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করলাম। যদি তা সত্য বলে মনে করা হয় অথবা ইতিহাস পাঠ করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের কাছে আমার একটা আরজ, যদি এই জাতি, এই সংস্কৃতি, এই সভ্যতার প্রতি কোনরূপ ভালবাসা জন্মে, তাহলে উচিত হবে আগামী বছরের ৩১শে ডিসেম্বর দিবাগত রাতে প্রতিরোধের ব্যূহ সৃষ্টি করা। আমাদের বুঝা উচিত, যারা নিজেদের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছ্যুৎ হয়, নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে দূরে সরে যায় এবং অপর সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সেবাদাসে পরিণত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে দুকুলই হারায়। ইতিহাসে তারা নিজ সংস্কৃতির বিশ্বাসঘাতক হয়ে চিত্রিত হয়। স্বধর্মাবলম্বীরা ভাবে ওরা ধর্মদ্রোহী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান অনেকটা বাদুড়ের মত, না একুলে না ওকুলে।

যে সব মুসলিম যুবক-যুবতী বিভ্রান্ত হয়ে উদভ্রান্তের মত সে রাতে উন্মাতাল হয়ে যা করেন, তারা যে লক্ষ্যে এত কিছু করেন, তা কেন করেন, ইতিহাসটা পাঠ করে কি দেখবেন? আমার সবিনয় নিবেদন, অন্তত জেনে-শুনে নাচুন, না জেনে না শুনে মুর্খের মত নাচবেন না। আধুনিক তথাকথিত সভ্যতায় মদকে মেনে নিলেও মাতালকে কেউ মানে না। ব্যাঙের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যাঙের লাফকে কেউ দোষের মনে করে না, এটা তার চলার প্রকৃতি, কিন্তু মানুষকে ব্যাঙের মত লাফাতে দেখলে লোকে পাগল বলে, হাতে লাগে হাতকড়া, সে রাতে যেমন অনেকের হাতে হাতকড়া পরানো হয়।

থার্টি ফার্স্ট নাইট এক বন্য উৎসব : এই শিরোনামে দৈনিক মানবজমিন-এ ২০০০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তা পাঠ করলে

www.nagorikpathagar.org

উদযাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনটি আমি নিম্নে পেশ করলাম :

ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে রাজধানী আনন্দ-স্ফূর্তি, হই-হুল্লোড়, উদ্দাম নৃত্য, বন্য ও বেসামাল আচরণে মেতে ওঠেছিলো। রমজানের পবিত্রতা আর শীতের কাঁপনিকে আড়াল করে রাজপথে যে সব তরুণ উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে স্ফূর্তির খোরাক খুঁজতে গিয়েছিলো, তারা অবশ্য পুলিশের জলকামান থেকে ছোড়া ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা খেয়েছে। থার্টি ফার্স্ট বুঝতে অক্ষম নিম্নবিত্তেরা ঘুম গেলেও কেবল টিভির মধ্যবিত্তেরা রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলে চিৎকার দিতে কার্পণ্য করেনি। যেসব এলাকায় বিত্তবান ও বিদেশীদের সমাগম, সে সব স্থানে ঘরে ঘরে পার্টি চললেও সে থেকে বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ তরুণরা রাস্তায় বন্যতা দেখিয়ে ঝাল মিটিয়েছে। 'মানবজমিন'-এর ৪ জন প্রতিবেদক সরজমিনে যা দেখেছেন তা হচ্ছে : ব্যাপক পুলিশি প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও থার্টি ফার্স্টের রাতের উচ্ছৃঙ্খলা ঠেকানো যায়নি। লাঞ্ছিত হয়েছেন একাধিক তরুণী, উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের হাত থেকে এদের উদ্ধারে পুলিশকে পানি কামান পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছে। ব্যারিকেড ভেঙে প্রমোদ সঙ্গিনীসহ মাতাল যুবক গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর। বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা। মোটর সাইকেল র‍্যালি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ছাত্র নেতা শিশিরকে। পুলিশের দু'টি প্রিজন ভ্যান আগেই অপেক্ষা করছিলো, রাত ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত গুলশান দুই নম্বর গোল চত্বরেই পুলিশ আটক করেছে ৭৫ জন যুবককে। গুলশান থানার হিসাবে ওই রাতে আটক হয়েছে মোট ১৬০ জন যুবক। তেজগাঁও থানাতে আটক ১১ জন এবং মিরপুর থানায় ৮ জন। বোমার আঘাতে আহত হয়েছে দু'জন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩শ' পুলিশ সদস্য গুলশান দুই নম্বর গোল চত্বরে থার্টি ফার্স্টের উন্মাদনা রুখতে প্রচণ্ড শীতেও গলদঘর্ম হয়েছেন। হয়েছেন বিব্রত। একটার পর একটা গাড়িতে তল্লাশি চলাকালে শুধু মাতাল যুবকদেরই নয়, তারা মাঝ রাতে উৎসব-উচ্ছৃঙ্খলতার ভিড়ে সরকারের অনেক উচ্চ পদস্থ কমকর্তা এবং একজন মন্ত্রীরও দর্শন পেয়েছেন। ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টার ঘর ছুঁতেই হাজার হাজার তরুণ-তরুণী 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ধ্বনি দিয়ে নেমে পড়ে গুলশানের রাস্তায়। গুলশান দুই নম্বরে পুলিশ গড়ে তোলে নিশ্ছিদ্র ব্যারিকেড। তবু বাধা মানেনি ওরা। বাঁধ ভাঙা

www.nagorikpathagar.org

জোয়ারের মতো মোটর সাইকেল এবং খোলা পাজেরোতে করে তরুণ-তরুণীরা নেমে পড়ে রাস্তায়-বিয়ারের ক্যান, আর বিদেশী শ্যাম্পেনের বোতল হাতে ছিলো এদের। রাত ১২টা ২৫ মিনিটে রিকশা করে গুলশান-২ নম্বর থেকে এক নম্বরের দিকে যাচ্ছিলেন দু'জন তরুণ-তরুণী। গুলশান পূবালী ব্যাংকের সামনে এলেই উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণ-তরুণীদ্বয়ের ওপর। এক পর্যায়ে তরুণীটিকে রিকশা থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে ফেলে উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা। হাত চালিয়ে দেয় তরুণীটির শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে। অসহায় তরুণীটি তখন নির্বাক। শরীরে যা ছিল, তার বেশির ভাগ তখন যুবকদের টানাটানিতে ছিড়ে গেছে। ১০ মিনিট ধরে এভাবে চলার পর পুলিশের জলকামান ব্যবহার শুরু হয়। জলকামান আর পুলিশি তৎপরতায় অবশেষে মেয়েটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রায় ১৫/২০টি মোটর সাইকেলে করে গুলশান এক, দুই এবং বারিধারার দিকে চক্কর দিতে থাকা যুবকদের পুলিশ চ্যালে করে। সেখানে প্রায় ৫টি মোটর সাইকেল আটক করে পুলিশ। একটির থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ছাত্র নেতা শিশিরকে। এই গাড়িটির নম্বর পাবনা-এ-০২-০৩-২৭। পৌনে ১টার দিকে একটি প্রাইভেট কার আক্রান্ত হয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের হাতে। এই গাড়িটির চালক বাদে বাকি তিনজন ছিলেন তরুণী। উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা গাড়িটির বনেটের উপরে উঠে গিয়ে মেয়েদের টেনে বের করতে চায়। এক যুবক সরাসরি জানালা দিয়ে চুমু দিয়ে দেয় তরুণীকে। উপায়ন্তর না দেখে এরা ফিরে যায়। রাত ১টার পর উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু হয় পুলিশের ধরপাকড়। তরুণী লাঞ্ছিত, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ট্রাফিক রুল লংঘনসহ বিভিন্ন অপরাধে বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ অসংখ্য যুবককে গ্রেফতার করে। আগেই পুলিশ দু'টি প্রিজন ভ্যান এনে রেখেছিলো, প্রায় দুইশ'রও বেশি পুলিশ থার্টি ফার্স্টের প্রথম প্রহরে উচ্ছৃঙ্খলতা ঠেকাতে মাঠে নেমেছিলেন। এদের মধ্যে ডিএমপি কমিশনার শামসুদ্দীন আহমদ, ডিসি ডিবি আলতাফ হোসেন, ডিসি ট্রাফিক মোস্তাক আহমদ চৌধুরীসহ পুলিশের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা ঠেকানোর অভিযানে। রাত ২টা ৩ মিনিটে ঘটে সবচেয়ে বড় অঘটন। বারিধারার দিক থেকে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন এক মাতাল যুবক, সাথে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা তিন তরুণী। গুলশান দুই নম্বর গোল চত্বরের সামনে এলে পুলিশ চ্যালেঞ্জ করে গাড়িটিকে। যুবকটি ইংরেজিতে পুলিশকে গালিগালাজ করতে থাকে। এরপর প্রায় ৫০ জন পুলিশ গাড়িটি স্লো

www.nagorikpathagar.org

করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মুহূর্তে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ৪ পুলিশ কর্মকর্তাকে চাপা দিয়ে মাতাল যুবক গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। এতে এডিসি রায়ট আনসার উদ্দিন পাঠান, এডিসি ট্রাফিক আবুল কালাম আজাদ, এসি ট্রাফিক সেলিম জাহাঙ্গীর এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এনামুল হক দুলাল আহত হন। এ খবর সাথে সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় বিভিন্ন পয়েন্টে। ডিএমপি কমিশনার অনুসরণ করেন গাড়িটিকে। এক নম্বর গুলশানে আবারো কমিশনারকে ফাঁকি দিয়ে গাড়িটি উত্তরার দিকে চলে যায়। ডিএমপি কমিশনার রাত ২টা ৩০ মিনিটে জানান, গাড়িটির নম্বর ০২-৪১৩৫ কিন্তু কোন্ সিরিজের সেটা জানাতে পারেননি। রাত ১টা ১৬ মিনিটে সরকারের জনৈক মন্ত্রীকেও গুলশানে গাড়িতে চড়ে যেতে দেখা যায়। রাত যত বাড়ে, মাতাল যুবকদের চলাচল ততো বৃদ্ধি পায়। পুলিশ প্রায় সব গাড়িকেই চ্যালেঞ্জ করে। পুলিশ যতো গাড়ি চেক করে, সব গাড়িতেই ছিলো মাতাল তরুণ-তরুণী, ছিলো বিয়ার, হুইস্কির অসংখ্য ক্যান, বোতল। মদ্যপ এসব তরুণ-তরুণী পুলিশের সাথে ইংরেজিতে বাক্য বিনিময় করতে থাকলে পুলিশ এক পর্যায়ে তাদের বলেন, 'থ্যাংক ইউ' মাইরেন না, ফোটেন আর আইবেন না।

অভিমানী যুবকরা গুলশান-বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে দল বেঁধে মিছিল বের করে। গুলশান ২ নম্বর থেকে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে এসে একদল যুবক উইমপি ফাস্ট ফুডের দোকানে হামলা চালাতে উদ্যত হলে পুলিশ তাদেরও ধাওয়া করে। রাত ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে বনানী এলাকায় ভিডিও কানেকশান দোকানের কাছে এক বিদেশিনী বাঙালি যুবকদের মিছিলের মুখে পড়ে। মেয়েটির সাথে যুবকদের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মিটমাট করে দেয়। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর বেশ ক'টি স্পটে কড়া পুলিশ প্রহরা থাকায় যুবকরা অন্যান্য বারের মতো রাস্তায় মাতলামি করতে পারেনি। লিজমুর ফাস্ট ফুডের একজন সিকিউরিটি গার্ড জানান, এবার আমরা টেনশনমুক্ত। অন্য বছর উত্তেজিত যুবকরা দোকানে এসে ফাও খেতো। ভাঙচুর করতো। এবার তা হয়নি। রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে এভিনিউর ব্রিজের কাছে যুবকরা একটা প্রাইভেট কারের উপর চড়ে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। পেছন থেকে পুলিশের ফোর্স এসে এদের ধাওয়া করে। রাস্তায় এবার মেয়েদের উপস্থিতি ছিলো কম। যুবকরা দল বেঁধে 'হ্যাপি নিউইয়ার' স্লোগান দেয়। মূল সড়কের

www.nagorikpathagar.org

ভেতরের বাড়ির ছাদে বসে অনেকে বোমা ও পটকাবাজি করে। থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করতে আসা বেশ ক'জন যুবকের সাথে আলাপ হলে তারা জানান, এবার কোনো চার্ম পেলাম না। একদিকে রোজা অপরদিকে পুলিশের উপস্থিতি আমাদের আনন্দটাই নষ্ট করে দিয়েছে। অনেকেই বলেছেন, এবার কোনো মজা পেলাম না। অভিজাত এলাকার যুবকদের পাশাপাশি এবার মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরাও ওই এলাকায় থার্টি ফার্স্ট পালন করতে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল উৎসাহী যুবক অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন গুলশানে। কিন্তু তাদের আশা এবার পূরণ হয়নি। রাত ১টার পর পরই ঢাকা-গাজীপুর রুটের একটি বাস ভাড়া করে টিএসসিতে চলে আসতে দেখা যায় তাদের। বনানীতে এবার মদ-বিয়ারেরও বন্যা নামেনি। যারা এ সব করেছে খুব সাবধানেই করেছে।

চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের পর বেশ কিছু দিন ধরে গুলশানে চোরাই মদের রমরমা কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বছরের শেষ দিনে এ এলাকায় দেদার মদ বিক্রির মাত্রা ছিলো কম। যারা উন্মুক্ত স্থানে মদ্যপান করেছে তারা প্রক্রিয়াটিকে একটু আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছে। অনেককে গাড়ির ভেতরে বসে পান করতে দেখা গেছে। থার্টি ফার্স্ট উদযাপনের জন্য উন্মুখ এ কাফেলা রাত বাড়ার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে শহরের বিভিন্ন স্থানে। উত্তরা এলাকা তাদের জন্য হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় স্পট। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত গাড়িতে চড়ে উত্তরার বিভিন্ন রাস্তায় এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। রাত আড়াইটার পর থেকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে উৎসবের উত্তাপ। যে যার মত বাড়ি ফিরতে থাকে ক্লান্ত শরীরে।

পুলিশ অসংখ্য যুবক-যুবতীর থার্টি ফার্স্ট প্রথম প্রহরে গাড়ি চলাচলে বাধা দিলেও এক পর্যায়ে একটি গাড়ি পুলিশ আটকায় গুলশানে। সাথে গাড়ি থেকে নামেন পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তা। গাড়িটিতে বেশ ক'জন তরুণী। তিনি নামতেই সালাম ঠুকে দেয় অন্য পুলিশ। এরপর তরুণীদের উদ্দেশে বলেন, যেতে পারেন আপনারা যেখানে খুশি। গুলশানে যেতে কামাল আতাতুর্ক সড়ক ছাড়া আর সব সড়কই পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিলো কাটাতাঁরের বেড়া দিয়ে। ফলে একটি পথে যাওয়া-আসা করতে হয়েছিলো থার্টি ফার্স্ট উদযাপনকারীদের। রাত সাড়ে ৩টার দিকে গুলশান, বনানী ও বারিধারার রাস্তা বিয়ার ক্যানে ভরে গিয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

১১টা পর্যন্ত খোলা থাকার কথা থাকলেও প্রায় ১টা পর্যন্ত খোলা ছিলো ফাস্ট ফুডের দোকান উইমপি। আর সারা রাত ধরে খোলা ছিলো কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর লিজমোর রেস্টুরেন্ট। বারিধারার কূটনৈতিক পাড়ায় বিদেশীরা তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে ফুর্তি জমিয়েছিলো। নেচেছিলো চিয়ার্স ধ্বনি দিয়ে। উদযাপন করেছিলো নববর্ষ। ওখানে অবশ্য কোনো উচ্ছৃঙ্খল যুবক যায়নি। সারা রাতের উচ্ছৃঙ্খলতায় গুলশান পুলিশ আটক করে ১৬০ জনকে। এর মধ্যে ভোরেই ছেড়ে দেয় ১৪৯ জনকে। বাকি ১১ জনকে কোর্টে চালান দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : এ শতাব্দীর '৯৮ বছরের শেষ গোধূলি লগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়ে যায়। রাত যত বাড়তে থাকে আনন্দের কল্লোল ততই উপচে পড়তে থাকে। সন্ধ্যায় হলের সকল ছাত্রই টিএসসিতে চলে আসে। চলতে থাকে আনন্দের মহোৎসব। '৯৯ সালের শুরুর মহেন্দ্রক্ষণের জন্য তখন শুধু অপেক্ষার পালা। ক্যাম্পাসে পুলিশ ও ডিবি পুলিশ ছিল সদাসতর্ক। বিশেষ করে রোকেয়া হল ও শামছুন্নাহার হলের সামনে তাদের অবস্থান ছিলো সুদৃঢ়। কিন্তু তারা ছেলেমেয়েদের আনন্দেও বাধা দেয়নি। ঘড়ির কাটা যখন ১২টা ১ মিনিটে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি এলাকা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই গর্জনশীল। আনন্দের বন্যার যেন বাঁধ মানে না। সাইলেন্সারবিহীন মোটর সাইকেলের উচ্চ রব, প্রাইভেট কারের অডিও ক্যাসেটের উচ্চ ভলিউমে উত্তেজক গানের সুর এবং ছাত্রদের মিলিত কলরবে কনকনে শীতের রাতের নীরবতা ভেঙে একটি শব্দই ধ্বনিত হচ্ছিলো 'শুভ নববর্ষ'।

নববর্ষের প্রথম প্রহরে মেয়েদেরও ক্যাম্পাসে বিচরণ করতে দেখা গেছে। গাড়িতে চড়ে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাথে তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ক্যাম্পাসের ছাত্রদের সাথে তাদের 'ফ্লাইং কিস' বিনিময় করতে দেখা গেছে। হাত নাড়িয়ে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করেছে। অন্যান্য বারের মতো কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়নি। ইডেন কলেজের সামনেও ছেলেদের জটলা ছিলো। সামনের দিকে পুলিশের কড়া পাহারা থাকায় ছেলেরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তবে তারা বঞ্চিত ছিলো না। পলাশী রোড ও নীলক্ষেতের সংযোগ সড়কের পশ্চিম পার্শ্বের ইডেন কলেজের মেয়েদের নতুন হল থেকে 'সাড়া' ছিলো ব্যাপক। এ সাড়া শ্লীলতার মাত্রা লংঘন করেছে নিমেশেই।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে পুলিশের কোনো পাহারা না থাকায় ছেলেরা প্রশ্রয় পায়। ছেলেদের এ প্রশ্রয়ে মেয়েরাও হয়ে ওঠে উন্মাতাল। নিউ মার্কেট থেকে আসাদ গেট পর্যন্ত নববর্ষ উদযাপনের আকাঙ্ক্ষীদের পদচারণা ছিলো। রিকশা, ভ্যান এবং গাড়িতে চড়ে অনেকেই নববর্ষের বিহারে বের হতে দেখা গেছে। আসাদ গেটের কাছে ফটকা ফুটতেও শোনা যায়।

দৈনিক সংগ্রামে শাওন আখতার বাঁধনের উদ্দেশে লেখা আমার নিবন্ধটি ১৬/১/২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয়। লেখাটি এখন পাঠকদের উপহার দিলাম।

শাওন আখতার বাঁধন। তোমাকে কি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করি, স্থির করতে পারছি না। থার্টি ফার্স্ট নাইটে তোমার দেহকে মানুষরূপী শ্বাপদরা যেভাবে ছোবলে, দংশনে, বেস্টনে, ম্যাসেজে, স্কুইজে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তার ছবি দেখে ও বিবরণ পত্রপত্রিকায় পাঠ করে ঐ মানুষরূপী শ্বাপদদের বিরুদ্ধে মনটা আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আর তোমার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় মনটা ভরে উঠেছিল। তারপর? তারপর পরবর্তী ৭/৮ দিন পত্র-পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ আর তোমার সম্পর্কে যা অবগত হলাম, এরপর আমার মনের আর মেজাজের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। ঘটনা আর তোমার সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, তা কোন 'মৌলবাদী' পত্রিকা পাঠ করে জানিনি, জেনেছি অমৌলবাদী পত্রপত্রিকা পাঠ করেই। তোমাদের সংস্কৃতি লাইনের কাগজই বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশন করেছে। একমনা কাগজ তো মিথ্যা বলে লাইনের লোককে সাধারণত কলংকিত করে না, কিন্তু সত্যকে ইচ্ছা থাকলে গোপন করতে পারেনি। তাই আমি সঙ্গত কারণে ধরে নিয়েছি, লাইনের কাগজগুলো যা পরিবেশন করেছে সবই সত্য, হয়তো আরও কিছু সত্য ছিল যা প্রকাশ করেনি।

শুরুতে বলেছিলাম, তোমাকে কি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করবো। 'মা' বলে আমি সম্বোধন করতে পারি। কারণ, তোমার আর আমার বয়সের ব্যবধানটায় এ সম্বোধনে কোন বাধা নেই। কিন্তু কলংকের যে কালিমা তুমি শখে ও স্বেচ্ছায় বদনে ও সম্ভ্রমে লেপন করেছো, তা জানার পর 'মা' সম্বোধনে তোমাকে ডাক দিতে আমিই লজ্জাবোধ করছি। শখে ও স্বেচ্ছায় তুমি নিজের দেহ ও সম্ভ্রমকে বিধ্বস্ত করেছো এ কথা বললাম, তোমাদের লাইনের একটি পত্রিকার রিপোর্ট পাঠ করে। তুমি নাকি সে রাতের মিলেনিয়াম অনুষ্ঠান 'এনজয়' করার জন্য দেশের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসেছ ৪/৫ দিন আগে। কিভাবে সাধের এই নাইট 'এনজয়'

www.nagorikpathagar.org

করবে সে পরিকল্পনা ৪/৫ দিন ধরে করেছ, প্রস্তুতি নিয়েছ, বান্ধবী-বন্ধু যোগাড় করেছো, অতপর আকাঙ্ক্ষিত রাতের ১০টায় রাতের আহার বাসায় না করেই খালি পেটে বান্ধবীর স্বামীকে সাথে নিয়ে বের হয়েছ। তোমাদের সাথে ছিল তোমারই আর এক বান্ধবীর স্বামী এবং তাদের স্ত্রী। তাদের নিয়ে তুমি এক নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সেখানে কি এক অঘটন ঘটিয়ে কেটে পড়েছিলে। তারপর শেরাটনে গিয়ে রাত ১টা ৩০ মিনিটে ডিনার খেয়েছ। শেরাটন থেকে রাত ২টার পর টিএসসি এলাকায় গিয়ে বান্ধবীর স্বামীর গাড়ি থেকে অবতরণ করেই নাকি এই ভিড়ের মাঝেই বলেছিলে, 'এক নাচের অনুষ্ঠান থেকে এসেছি, তাদের নাচিয়ে, টিএসসি এলাকায় সবাইকে এবার নাচাবো।' এ ঘোষণার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে তোমাকে যৌন ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত যুবকেরা ঘিরে ফেলে। অতঃপর নেচে গেয়েই তোমাকে মনের মত ভোগ করে। সত্যি, তুমিই তাদের নাচিয়েছ, পরিতৃপ্ত করেছ। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পুলিশ অদূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে হাসছিল। শত শত শকুন যেন এক জীবন্ত লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুলিশ তো হাসবেই, তারা হয়তো মনে করেছিল, এটাও মিলেনিয়াম অনুষ্ঠানের এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ ছিল পুলিশদের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমরা বাধা দিতে গিয়ে আবার কোন্ ঝামেলায় পড়ি। তাই তো পুলিশরা অনুষ্ঠান উপভোগ করছিল। তারা যেমন বুঝেছে, তেমন করেছে। পরে যখন তারা বুঝতে পারলো যে, এ তো মিলেনিয়ামের কোন অনুষ্ঠান নয়, তখন পুলিশ এগিয়ে যায় এবং তোমাকে উদ্ধার করে বান্ধবীর স্বামীর গাড়িতে তুলে দিয়ে বাসায় পাঠায়। এখন দোষটা তুমি কাদের দিচ্ছ? এক নম্বরের দোষী তো স্বয়ং তুমি। এই সীন তুমিই ক্রিয়েট করেছ। শকুনেরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে মাত্র। ছোটখাটো ঘটনা সে রাতে আরও ঘটেছে, কিন্তু তোমার মত রেকর্ড আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। এদিক দিয়ে তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তাই তোমাকে বলা যায়, বাংলাদেশের একমাত্র মিলেনিয়াম নারী। তুমি যেভাবে তোমার নিরাপত্তার ও সম্ভ্রমের 'বাঁধন' খুলে দিয়ে মিলেনিয়াম অনুষ্ঠানে দশের ভোগে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ, এমন সেক্রিফাইস ক'জনা করতে পারে? তাই তো মিলেনিয়াম যুবতী একমাত্র তুমিই, আর তোমাকে এ গৌরব দানে যার সর্বাধিক অবদান, সে হলো রাসেল।

আচ্ছা মা বাঁধন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি- তুমি গাজীপুরের একটি কলেজে লেখাপড়া কর। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে সব ছাত্র এবং অছাত্র তোমাকে নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, দিগম্বর করে তারা যেভাবে পারে তোমাকে নির্মমভাবে ভোগ

www.nagorikpathagar.org

করেছে, তাদের তুমি চিনতে পারলে কেমন করে? তাদের তো তোমার চেনার কথা নয়। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ক্লাসে ওরা আর তুমি লেখাপড়া করলে তোমার দাবি সঠিক বলে মনে করা হতো। কিন্তু তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের ব্যবধান অনেক, তারপরও তুমি তাদের চিন, এ দাবি তুমি করেছো পুলিশের কাছেও। বুঝলাম না তোমার চেনার সূত্র ও চ্যানেল। তাহলে কি ধরে নেয়া যায়, ওদের তুমি আগে থেকেই চিনতে? অথবা ঘটনার ৬ দিন পর তোমাকে পুলিশ আবিষ্কার করে যে এজহার আদায় করে তা ছিল বানোয়াট এক এজহার, যাতে তোমার দস্তখত ছাড়া নিজস্ব কোন কিছু ছিল না। অথবা নাটক তৈরি করার জন্য তুমিই উপদেষ্টাদের উপদেশ নিয়ে এমন করেছো। মা বাঁধন, তোমার যে পরিচয় এবং অতীত জীবন-কথা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় তোমার পাপ অনেক আগে থেকে বালেগ হতে থাকে অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌঁছতে মাত্র একটা ঘটনাই বাকি ছিল, তাও থার্টি ফার্স্ট নাইটে পূর্ণ হলো। যে জীবন ধারাকে তুমি সংস্কৃতি মনে করতে, সেই জীবনধারা তোমাকে দেউলিয়া বানিয়েছে। তুমিই ডিবি পুলিশকে বলেছ, তোমার সবই শেষ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট কিছুই নেই। এই বক্তব্য অনুযায়ী তোমার অবস্থান শূন্যতায়। এই শূন্য বা জিরো থেকে তোমার যাত্রা শুরু করতে হলে সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা। এর একটি হলো তসলিমা নাসরিনের পথ ধরা অথবা তওবা করে তাহেরা (পবিত্র) হয়ে নতুন জীবন শুরু করা। প্রথম ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তো পরিপূর্ণভাবে অর্জন করেছো, আর তো কিছু বাকি নেই। এখন তুমি দ্বিতীয় পথ ধরে দেখতে পার অর্জিত পাপস্খলন হয় কিনা এবং মনে প্রশান্তি পাও কিনা। আমার তো বদ্ধমূল ধারণা, তওবার মত তওবা করলে এবং অনুশোচনায় বিগলিত হৃদয়ে তওবা অনুযায়ী কঠিন এবাদত-অনুশীলন করলে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিতে পারেন এবং অতীতের জীবন ও জ্বালা দূর হতে পারে এবং শ্বাপদ ও শকুনদের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও মনের গ্লানি এবং বেদনা সেরে যেতেও পারে। আল্লাহ সব কিছু পারেন, তিনি সর্বশক্তিমান।

তবে তুমি যাদের খপ্পরে পড়েছো, রাজনীতির যে জালে জড়িয়েছ, তা থেকে তুমি রেহাই পাবে বলে মনে হয় না, যদি তোমার ভূমিকা সে অনুযায়ী না হয়। তোমাকে নিয়ে রাজনীতি চলবে। তুমি ইতোমধ্যেই রাজনীতির জালে আটকা

www.nagorikpathagar.org

পড়েছো। তাদের কথা তোমার মুখ দিয়ে বের করতে হবে, তাদের কথা তোমাকে লিখতে হবে, তাদের কথায় সায় দিতে হবে, তাদের কথা মত তোমার দেহ চেকআপ করতে হবে। চিকিৎসা বোর্ডের সম্মুখিন হতে হবে, উধোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে হবে। এবার চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সংস্কৃতির চুলকানির জ্বালা কত ব্যাপক।

বাঁধন, যারা তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তাদের তুমি শ্বাপদ শকুন, শূয়োর বলে গালি দিয়েছো। তুমি তাহলে কি? তুমিও তো একই প্রজাতির। পার্থক্য শুধু এই, ওরা নর আর তুমি নারী। খাসলতে একই চরিত্র, অভিন্ন। ওরা মিলেনিয়াম নর আর তুমি হলে মিলেনিয়াম নারী। মিলেনিয়াম অনুষ্ঠানে এসেছিলে। তাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কি অন্যায় তারা করেছে? এই রাতে কি হবে তা তো পত্রপত্রিকা এক মাস আগে থেকে পূর্বাভাস দিয়ে আসছে। যারা সে রাতে সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে তাদের সবাই সেই মানসিকতা সম্পন্ন, সেই চরিত্রে চরিত্রবান, একই খাসলতের নরনারী। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে বা ছেলে এমন জাহান্নামী অনুষ্ঠানে কি যেতে পারে, না গিয়েছে? তোমাকে যারা ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তারা যে পদের তুমিও সে পদের। তুমি নিজেকে তাদের থেকে পার্থক্য করেছো কেন? তুমি কি জানতে যে মিলেনিয়াম অনুষ্ঠানে মিলেনিয়াম ফুল ফুটবে, সে অনুষ্ঠানে পবিত্রতার বারি বর্ষণে তারা অজু করে যাবে, দোয়া-দুরুদ পড়তে পড়তে যাবে, পবিত্র পরিবেশ থাকবে, নারীর সম্ভ্রম রক্ষা পাবে, সে রাতে রহমত বর্ষণ হবে? এমন ধারণা তোমার নিশ্চয়ই ছিল না। যে ধারণা ছিল, তা ছিল বিপরীত। পরিবেশের অনুকূল ঘটনাই ঘটেছে, তাহলে আফসোস কেন? ওরা সুযোগ নেয়ার অপরাধে অপরাধী, আর তুমি সুযোগ দেয়ার অপরাধে অপরাধী। দুই অপরাধীই সমান। এখন তোমার দেহ ও লুণ্ঠিত সম্ভ্রমই মূল পলিটিক্স, মামলার পয়েন্ট, তোমার বয়ানই শত্রু জব্দ করার আসল হাতিয়ার, তুমিই বিশেষ দলের বিশেষ ভরসা। তোমাকে দিয়ে কতিপয় নাম মুখস্ত করানো হবে, ফটো দিয়ে চেহারার পরিচয় করানো হবে। বাঘ শিকারে যেমন শিকারীরা ছাগলকে বাঘের টোপ হিসেবে দিয়ে থাকে, তোমাকে দিয়ে ছাগল টোপ বানানো হবে। তুমি এমন সংস্কৃতির পথে পা বাড়িয়েছ, যে পথে শুধু চলতে হবে আমৃত্যু, প্রত্যাবর্তনের সকল পথ রুদ্ধ। জানি না, তোমাকে কত দিন এভাবে পলিটিক্যাল ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

হতে হবে। একটা সত্যকে নিয়ে তুমি ভেবে দেখ, যে রাসেলরা উন্মাতাল হয়ে তোমাকে সব দিক দিয়ে শেষ করেছে, তাদের যে কোন একজনও তোমাকে স্ত্রী হিসেবে কি গ্রহণ করবে? মোটেই না। এই পরিণতির কথা যখন জান, তখন কেন তাদের ভোগের সামগ্রী হয়ে সামনে ঘুর ঘুর করো, এর চেয়ে কি ভাল ছিল না কারো জীবন সঙ্গিনী হওয়ার জন্য বৈধ পথে চেষ্টা করা? সে পথ তো মৌলবাদী পথ তোমাদের কাছে, তাই বরাবর তা পরিহার করে চলে আসছো? এখন যে তোমার মূল ও মূল্য উভয়ই গেল। চিন্তা করে কি দেখেছো এ ব্যাপারটা নিয়ে? সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশা তোমার ছিল কিনা জানি না, থাকলেও সে লক্ষ্যে তোমার অনুশীলন ছিল না। তোমাদের সুন্দর জীবনের ধারণায় শ্বাপদ, শকুন ও শূকরের ছায়া দেখা যায়। আর এ ধারণার পরিণতি ও পরিণাম হলো তাই, যা তুমি তোমার জীবন ও সম্ভ্রম দিয়ে সে রাতে অর্জন করেছো। তোমার লাইনের পূর্বসূরীদের পরিণতি ও পরিণামের কথা স্মরণ কর, তাহলে কল্পনার চোখে দেখবে শ্বাপদ আর শকুনের উপদ্রব আর উৎপাত।

বাঁধন, অভিজ্ঞতা তো হলো প্রচুর। এখন বুঝতে পারলে পূর্বসূরীদের চলা পথের পরিণতি অত্যন্ত দুঃখময়। থানা পুলিশ মামলা-মোকদ্দমা তো আছেই, ভবিষ্যতও অন্ধকার। পরিত্যক্ত কলার ছোবড়া, তাও ঘৃণার ডাস্টবিনে অবস্থান। তোমার নাম যে উচ্চারণ করবে, তোমার চেহারা কল্পনায়ও যার চোখে ভাসবে, সে রাতের তোমার ঘটনার কাহিনী যে স্মরণ করবে, সে তোমার উদ্দেশে ঘৃণার থু থু নিক্ষেপ করবে। এমন পরিণতি যাদের ঘটে, তাদের মুক্তি শুধু মৃত্যুর মধ্যে নিহিত। দশজনের বাক্যবাণ থেকে তো নিস্তার মিলবে যদিও পরকালে ভয়াবহ আযাব অপেক্ষা করবে আপতিত হওয়ার জন্য। আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন জ্বালা দূর করতে গেলে দুনিয়া ও আখেরাত দুই যাবে। বাঁচার একটা পথই খোলা আছে, তা হলো, ঠিক বিপরীত জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি ও প্র্যাকটিস। তওবা-তুন-নসুহা। নতুন জীবন শুরু করা, যে জীবনের প্রাত্যহিক এবাদতের কঠোর অনুশীলনে পাপের বোঝা আল্লাহ হালকা করবে। লোকজনও বলবে পাপের পথে যে ছিল দ্রুত ধাবমান, সে এখন পূণ্যের পথে তার চেয়ে বেশি অগ্রসরমান। যাদের মনে কু-ধারণা ছিল, যারা তোমাকে নিয়ে মনের মুকুরে খারাপ ছবির প্রতিবিম্ব দেখতো, তাদের মনে আল্লাহ পাক সু-ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং তোমাকে বলে রাখি, পুলিশের আর মামলার ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া তোমার এই দুনিয়াতে ও আখেরাতে মুক্তি নেই। কথাটা তোমার কাছে মৌলবাদী কথা বলে মনে হবে, কিন্তু এ কথাই মূল কথা। ২৪ বছর তো যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, তারপরও যদি হুঁশ না হয়, তাহলে যে অনলে দাহ হতে চলছো, আমৃত্যু একই অনলে পুড়বে সুনিশ্চিত।

যদি তুমি মনে করে থাক, জীবনটা তুমি যেভাবে যে পদ্ধতিতে অতিবাহিত করেছ এ পদ্ধতিতে জীবন-যাপনের পরিণতি দুঃখময়, নরক জ্বালার মত অসহনীয়, তাহলে সুন্দর জীবনের দিকে মুখ ফেরাও আর তোমার লাইনের মেয়েদের এবং উত্তরসূরীদের উদ্দেশে এ কথা বল যে, অপসংস্কৃতির বিড়ম্বিত জীবনের আমি এক বিধ্বস্ত নির্মম মডেল। আমার জীবন থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যে পথে তোমরা চলছো বা চলার জন্য রিহার্সেল দিচ্ছ, সে পথ পরিহার করো। এ পথে শ্বাপদ, শকুন আর শূয়োরের চলাফেরা। কখন যে ওরা কার ওপর হামলা করে বসে, তা বলা যায় না। ওরা আমাকে যেমন ক্ষত-বিক্ষত করেছে তোমাদেরও করবে। থার্টি ফার্স্ট নাইট সংস্কৃতি শুধু আমার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেনি, সম্ভ্রমের বস্ত্র পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। আমি শাওন আখতার বাঁধনের মর্মান্তিক পরিণতি থেকে তোমরা সুন্দর জীবন-যাপনের শিক্ষা গ্রহণ করো।

বাঁধন, তুমি অপসংস্কৃতির বাঁধন মুক্ত হও, এখনও হুঁশে আস, তোমার জন্য রইলো আমার এ দোয়া। তোমার সে রাতের কর্মকাণ্ডকে জয়নাল হাজারীর মত মানুষ ঘৃণা করে বই ছেপেছিল। এবার বুঝে নাও, তোমার অবস্থান জয়নাল হাজারীর ঘৃণারও নিচে।

www.nagorikpathagar.org

অসবর্ণ সিঁদুরে বসন্ত বরণ

[একটি দৈনিকের রিপোর্ট : প্রসঙ্গ বইমেলায় বসন্ত বন্দনা। রিপোর্টের কয়েকটি লাইন হলো এই- 'কাল ছিল শতাব্দীর শেষ বসন্তের প্রথম দিন। সারা দিন বইমেলা খোলা ছিল। মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে খোঁপায় সাদা ফুল গুঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে। ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী চটি পরে স্বাগত জানিয়েছে বসন্তকে। অনেককে ধুতি পরে কপালে তিলক এঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। সকালে চারুকলার ছেলেমেয়েরা বইমেলায় গিয়ে সবার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে কয়েকজন রঙচঙ মেখে মিছিল করেছে। কাল শুধু বসন্ত নয়, ছিল রোজারও প্রথম দিন। তাই হলুদের সমারোহ খুব একটা ছিল না। ...ইফতারের পর পর মেলায় এসেছিলেন শিব নারায়ণ রায় সাথে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। একটি সেমিনারে যোগ দিতে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা এসেছেন, উঠেছেন তসলিমা নাসরিনের বাসায়।']

www.nagorikpathagar.org

১৪ই ফেব্রুয়ারি (১৯৯৪) একটি দৈনিকের রিপোর্ট : প্রসঙ্গ বইমেলায় বসন্ত বন্দনা। রিপোর্টের কয়েকটি লাইন হলো এই-'কাল ছিল শতাব্দীর শেষ বসন্তের প্রথম দিন। সারা দিন বইমেলা খোলা ছিল। মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে খোঁপায় সাদা ফুল গুঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে। ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী চটি পরে স্বাগত জানিয়েছে বসন্তকে। অনেককে ধুতি পরে কপালে তিলক এঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। সকালে চারুকলার ছেলেমেয়েরা বইমেলায় গিয়ে সবার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে কয়েকজন রঙচঙ মেখে মিছিল করেছে। কাল শুধু বসন্ত নয়, ছিল রোজারও প্রথম দিন। তাই হলুদের সমারোহ খুব একটা ছিল না। ...ইফতারের পর পর মেলায় এসেছিলেন শিব নারায়ণ রায় সাথে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। একটি সেমিনারে যোগ দিতে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা এসেছেন, উঠেছেন তসলিমা নাসরিনের বাসায়।'

এই হলো পূর্ণ রিপোর্টের অংশ বিশেষ। বসন্তবরণ অনুষ্ঠানের প্রধান দুই অতিথি ঢাকা অবস্থানের জন্য তসলিমার বাসাকেই বেছে নিলেন। আমি এই পছন্দকে মোটেই না-পছন্দ করিনি। করিনি এ জন্য যে, যাদের ঠিকানা যেখানে, উঠবেন তারা সেখানে। দুর্জনও তার স্বজন ছাড়া চলে না, সমাজ করে না। স্বজনে স্বজন চিনে, সজনীকে স্বজনরা চিনে আরও ভাল। আরামের বাসস্থান, নিরাপদ অবস্থান, বিশ্বস্ত ঠিকানা। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের প্রিন্সিপাল যদি ব্যবসা উপলক্ষে বিদেশ যান, তাহলে তিনি লোকাল এজেন্ট শেল্টারে বা তত্ত্বাবধানে থাকেন। দ্বিপাক্ষিক স্বার্থই প্রিন্সিপাল আর এজেন্টকে নিবিড় সান্নিধ্যে আনে। শিব নারায়ণ রায়রা তসলিমা নাসরিনের বাসায় উঠে নিশ্চয়ই ভুল করেননি। এজেন্টও প্রিন্সিপালের দেশে গেলে প্রিন্সিপালদের শেল্টারে আর তত্ত্বাবধানে থাকেন। এটা নিউজ হওয়ার মত ছিল না, তবুও নিউজ হয়েছে। বোধহয় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য। হ্যাঁ, সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানছি।

এবার সিঁদুর প্রসঙ্গে আসা যাক। সিঁদুর সুরমা প্রাত্যহিক ব্যবহারের দু'টি বস্তু। সিঁদুর ব্যবহার করেন বিবাহিত হিন্দু নারীরা আর সুরমা ব্যবহার করেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমানরা। অবশ্য সুরমার ব্যবহার আজকাল অনেক কমে গেছে। কিন্তু এখনও অনেকে নিয়মিত ব্যবহার করেন ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে। সিঁদুর আর সুরমার ব্যবহার দু'ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এই দু'ধর্মাবলম্বী মানুষ এই দু'টি বস্তুর ব্যবহার করেন ধর্মীয় মন নিয়ে পূণ্য আর সওয়াবের নিয়ত নিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

কোন কারণে বা কোন অবস্থাতেই কোন হিন্দু নারী-পুরুষ সুরমা ব্যবহার করেন না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান নারী ধর্মীয় মন নিয়ে সিঁদুর ব্যবহার করেন না। তাই এ দু'টি বস্তুর ব্যবহার ক্ষেত্র পৃথক।

সুরমার দিকে হিন্দু ললনারা হাত বাড়াননি কখনো এবং এখনও হাত বাড়াচ্ছেন না। কিন্তু বাংলাদেশে মুসলিম নামধারী একটি শ্রেণী আছেন, তারা সিঁদুরের দিকে শুধু হাতই বাড়াননি, সিঁদুর ব্যবহার শুরু করেছেন। তবে ধর্মীয় মন নিয়ে ব্যবহার শুরু না করলেও তথাকথিত সাংস্কৃতিক মন নিয়ে ব্যবহার শুরু করেছেন। সিঁথিতে সিঁদুর দেয় বিবাহিত হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। এই ব্যবহারের মধ্যে ধর্মীয় বিধানের মান্যতা ছাড়াও হয়তো সৌন্দর্য বোধটাও নিহিত থাকতে পারে। হিন্দু নারীদের সিঁদুর ব্যবহার দেখে এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী মহিলার লোভ বাড়ে। যে সব মুসলিম পরিবার থেকে দ্বীন ধর্মের চর্চা প্রায় উঠে যাচ্ছে বা উঠে গেছে, স্বকীয়তা বিদায় নিয়েছে এবং পরকীয়া সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে বা ঘটতে শুরু হয়েছে, আধুনিক ও সংস্কৃতিবান পরিবার বলে যারা সমাজে পরিচিত হওয়ার লোভে বা মোহে পড়েছেন, তাদের পরিবারে নতুন টাকার গরম প্রবেশ করেছে আর প্রবেশ করেছে এই অপসংস্কৃতি। অথচ পঞ্চাশ বছর আগে তাদের বাপ-দাদারা কল্পেও পেতেন না। আজ তারা সিঁদুর অনুকরণে সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য টিপ নামে কপালে সিঁদুর ফোটা লাগাতে শুরু করেছেন। কসমেটিকের ঘষাঘষি আর বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করে দশের নজর কাড়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার পরও যখন তারা ভাবতে লাগলেন, আর কি বাকি থাকলো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য? যা সাজসজ্জা করা হয়েছে, তাতে যদি দৃষ্টি কাড়তে সম্ভব না হয়, 'অপূর্ব' বলে কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, তাহলে তো সবই বরবাদ। তাই আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সিঁদুর আর লাল পালিশ নখে ব্যবহার শুরু করেন। এত করেও মনে হলো, হাতের নখে বা পায়ের নখে সিঁদুর-লাল দিয়ে রাঙিয়ে তুললে কি হবে, যদি কেউ নখের দিকে না তাকায়। এই সন্দেহ দূর করার জন্য কপালে জাহাজ, লঞ্চ ও মোটর গাড়ির হেড লাইটের মত কিছু ব্যবহার করা দরকার বলে তারা মনে করলেন। লাগিয়ে দিলেন সিঁদুর টিপ। এবার দৃষ্টি পড়বেই। ঠোঁটে লালে লাল, কপালে লাল হেড লাইট, হাতে-পায়ে লাল আর লাল, পেট উদাম, শ্লীভলেস ব্লাউজ, মাথায়-মুখে সুবাস আর সৌরভের বাহার, এত সবের মধ্যে কোন একটিতেও দৃষ্টি পড়বেই।

এভাবে শুরু হয় সিঁদুর অনুকরণের অনুশীলন। এ অনুশীলন চলছে জোরেসোরে এবং এর ব্যাপ্তি ঘটছে, ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। কেন এসব মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

পরিবারে প্রবেশ করলো? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিলে এই দেয়া যায় যে, এসব পরিবার দরজা-জানালা খোলা রেখেছিলেন বলে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। এর সাথে আরো ব্যাখ্যা করলে যা বলা যায় তা হচ্ছে এই, বন্যায় যাদের ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তারা আশ্রয় নেয় অন্য কোথাও। একটা আশ্রয় পেলেই মনে করে বাঁচা গেল। কিন্তু তাদেরও লক্ষ্য থাকে কখন বন্যার পানি কমবে এবং নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। পরকীয়া সংস্কৃতির বন্যার পানি যাদের ঘরে প্রবেশ করে, তারা পানি সরাবার সামান্যতম চেষ্টা না করে এই পানিতে সাঁতার কাটতে থাকেন। যারা মানসিক ভারসাম্য হারান, তারা পাগল বলে পরিচিতি লাভ করেন। তারা বুঝেন না নিজের লাভ-ক্ষতি, মনজিল তাদের ঠিক থাকে না। অপসংস্কৃতির দানব যাদের পাগল করে তারাও স্বকীয় ঐতিহ্য চিন্তার বা ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা হারায়। যা করে চকচক তা সোনা মনে করে বসে। জীবন চলার আসল পথ যারা হারায়, তাদের পথ চলার পথের অভাব হয় না, সামনে যে পথ পায় সে পথেই চলে। এ পথ তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে, সে চিন্তা করার মত মাথা তার থাকে না। সিঁদুর সংস্কৃতি যারা ধরেছে, তারা ঐ জাতের মানুষ। পথহারার দল।

সিঁদুর অনুকরণের কথা বলছিলাম। না, অনুকরণ-অনুসরণ নয়, সরাসরি তারা সিঁদুর ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শুধু তারাই ব্যবহার করছে না, যাকে সামনে পাচ্ছে তারই কপালে লাগাচ্ছে। ১লা ফাল্গুনে তারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দৈনিকটির রিপোর্ট তো তাই। উল্লেখ্য, দৈনিকটি বামপন্থী ঘরানার।

চারুকলার ছেলে-মেয়েরা সকাল বেলা দল বেধে হাতে সিঁদুর নিয়ে চেনা-অচেনা প্রত্যেকের কপালে এক পুছ লাগিয়ে দেয়ার এ অভিযান শুরু করার পরিকল্পনাটা নিশ্চয়ই কোন অবুঝ তরুণ-তরুণীর মাথা থেকে পয়দা হয়নি। অবশ্যই কোন পাকা বয়েসী সংস্কৃতির তাত্ত্বিক রাসপুটিন এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে চারুকলার ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, সংঘবদ্ধ করেছেন এবং অভিযানে পাঠিয়েছেন। যারা সিঁদুর লাগানোর অভিযাত্রী দলের সদস্য সদস্যা ছিলেন, তারা এতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন যে, প্রত্যেককে এক পুছ লাগিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বাছ-বিচার করেননি। এক দেহে লীন হওয়ার মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, তাদের জাত বিচার না করারই কথা। অপসংস্কৃতি আর হিন্দু ধর্মাচরণ বাংলাদেশের জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মাঠকর্মী হয়ে কাজ করছেন, আর ডিরেক্টর হয়ে ডাইরেকশন দিচ্ছেন, তারা হিন্দু-মুসলমান বাছ-বিচারে কেন যাবেন? বাংলা একাডেমী বইমেলার কোন এক স্টলের মালিক বললেন, 'আমি পুরুষ মানুষ এবং মুসলমান, বয়সও চল্লিশের ধারে কাছে। আফসোস! আমার কপালেও সিঁদুরের

www.nagorikpathagar.org

এক পুছ লেগেছে। মানা বা প্রতিবাদ করিনি ভয়ে। কারণ, কোন্ খেতাবে তারা ভূষিত করে তা বলা যায় না। স্টলটা তছনছ বা লুটপাট হওয়ারও ভয় ছিল।' তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কপালে তিলক এঁকেধূতি পরে যারা দল বেঁধে মেলায় এসে বসন্ত বরণ করে, তাদের প্রত্যেকেই কি হিন্দু ছিল? তিনি বললেন, কিছু তো হিন্দু ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে অধিকাংশ মুসলমান। আমি কয়েকজন মুসলিম যুবককেও দেখেছি, যাদের আমি চিনি। তাদের ছিল তিলক আঁকা কপাল এবং ধূতি পরিহিত। চারুকলার ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই মুসলমান। অথচ তারাই সিঁদুরের পুছ লাগাবার অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ভদ্রলোকের রিপোর্টে এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আমার তো এ বিশ্বাস আছে যে, এই বাংলাদেশে কোন হিন্দু ছেলে বা মেয়ে কোন মুসলমানের কপালে সিঁদুরের পুছ লাগাতে যাবে না বা সাহসও করবে না, এই কর্মটি মুসলিম নামধারী ভিন সংস্কৃতিতে দীক্ষাপ্রাপ্তরা করতে পারেন।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে যারা প্রাথমিক পর্যায়ে হাঁটা শিখেছে, তারা আজ দৌড় দিতে পারছে, যৌবনে পদার্পণ করেছে। এখন তারা গুরুদের তৈরি সংস্কৃতির ময়দানের পাকা খেলোয়াড়। সাহসও তাদের এতই বেড়েছে যে, কপালে তিলক এঁকে অন্য সংস্কৃতির পাবলিসিটি দিতেও প্রচুর উৎসাহ বোধ করে, কচ্ছপ প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল করতে মোটেই ইতস্তত বোধ করেন না। কুরআনের পলিটিক্যাল আয়াত কুরআন থেকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব রাখার হিম্মত পর্যন্ত দেখায়। তারা আচার্য-উপাচার্য আর সিঁদুর সংস্কৃতির নিবেদিত কর্মী হয়ে ১লা রমযানে যার তার কপালে সিঁদুর লাগাতে পারে। তাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই। পরবর্তী বছরগুলোতে বসন্ত বরণ যদি তারা করে রীতিমত পূজা-অর্চনা করে সত্যিকার আচার্য-উপাচার্যের পৌরহিত্যে, তাহলেও কেউ যেন অবাক না হোন। কারণ, তাদের পিছনে বিবেক-বুদ্ধি বিক্রি-বন্ধকজীবী যে শক্তিশালী বাহিনী আছে, সেই বাহিনী নিরন্তর উৎসাহ দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে, পথ দেখাচ্ছে, মন্ত্র শিখাচ্ছে, প্রগতির বাহানা খাড়া করে অপসংস্কৃতির পচা পুকুরে চুবিয়ে মারছে তরুণ-তরুণীদের।

মসজিদ-মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বক্তব্য আগেই রাখা হয়েছে, ইসলামের মৌল শিঁকড় উৎপাটনের অভিযান চলছে, পবিত্র কুরআনের পলিটিক্যাল আয়াত নিষিদ্ধের প্রস্তাব তো আগেই পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের কবর খুঁড়ার হুমকি-ধমকি দিয়ে দেখা হয়েছে কোন প্রতিবাদ নেই, বোরকা নিয়ে টানাটানি করেও দেখা গেল এ জাতির চেতনা মোটেই নড়ে না, এখন তারা ফিনিশিং টাচ

www.nagorikpathagar.org

দিতে ময়দানে নেমেছেন সিঁদুর হাতে নিয়ে। তারা আমাদের ঈমানের কপালে সিঁদুর লাগাচ্ছেন অথচ আমরা চুপচাপ।

বসন্ত একটি ঋতুর নাম মাত্র। বাংলাদেশে ষড়ঋতুর মধ্যে বসন্ত একটি। ঋতু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষা আসে, বর্ষার পর যেমন আসে শরৎ, হেমন্ত ও শীত, তেমনি আসে বসন্তও। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন চেহারায় বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। ইংল্যান্ডের বসন্ত, আফ্রিকার বসন্ত আর এশিয়ার বসন্ত এক নয়। চেহারাগত ও প্রাকৃতিক সাজসজ্জায় অনেক ফারাক আছে। তবুও যদি কোন দেশের বসন্ত ঋতু বরণের মাঝে কোন জাতির জাতিগত কৃষ্টি বা ধর্মীয় ঐতিহ্য লুকিয়ে থাকে, তারা বরণ করুক যেমন ইচ্ছা তেমন, কিন্তু যাদের কৃষ্টিগত ও জাতিগত কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তারা কেন এ নিয়ে এত মাতামাতি করেন, তা আমার বুঝে আসে না। বৈশাখ আর বসন্তকে যখন বরণ করা হয়, তখন শীত ও গ্রীষ্মকে কেন বরণ করা হয় না? বরণ করলে সব ক'টিকে বরণ করা উচিত। বসন্ত ঋতুর মধ্যে চৈত্রের গরমও আছে পুরা মাস- 'এসো হে গরম, এসো হে শীত, এসো ঝড়-তুফান, এসো বান-বন্যা' ধ্বনি তুলে কেন বরণ করা হয় না? বসন্ত বরণের জন্য বাসন্তী রঙের শাড়ি, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে কেন শাড়ি নির্ধারণ হয় না? কেন বরণ অনুষ্ঠান করা হয় না?

চারুকলার ছেলেমেয়েরা হাতে সিঁদুর নিয়ে বাংলা একাডেমীতে এসে মুসলমানদের কপালে সিঁদুরের পুছ দিল, তাদের কে প্রেরণ করলো? পেছন থেকে কে কলকাঠি নাড়লেন? চারুকলার মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখা উচিত, যাদের কপালে তারা সিঁদুরের পুছ দিলেন, এসব কপালের কোন কোনটি দিনে-রাতে পাঁচবার আল্লাহর উদ্দেশে সেজদায় নত নয়, সে কপাল জায়নামাজকে স্পর্শ করে। উলুধ্বনি দিয়ে আর রাখী বন্ধন পরিয়ে বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন মুসলমানরা আর কত দিন করবেন সেটাই প্রশ্ন। ১৯৯৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কবি শামসুর রাহমান নিজেই উলুধ্বনি দিয়ে বকুলতলায় বসন্ত উৎসব উদ্বোধন করেন। যাদের উলুধ্বনি দেয়ার কথা তারা দিল না।

www.nagorikpathagar.org

এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি

[শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যে আমাদের অবস্থান, তাই নয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। ওদের সমকামিতা, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর শরীরী ব্যবহার, লিভিং টুগেদার, জারজ সন্তানের উৎপাদন, বেলাল্লাপনা, যৌন জীবনধারা, মদ মাদকে বুঁদ হয়ে থাকা, কুত্তা স্টাইলে প্রস্রাব করা, ওদের সন্ত্রাসী সংজ্ঞা, ওদের শান্তি ফর্মুলা, ওদের পারিবারিক বিধি বিধান, আহার-বিহার আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী, আমাদের মূল্যবোধের খেলাপ, আমাদের ধ্যান-ধারণার খেলাপ। তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বক্রিল গতি সর্পবৎ, বিষাক্ত দংশন। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন তন্মধ্যে একটি। ওদের সংস্কৃতির ওপর আমরা লাহাওলা পড়ি।]

www.nagorikpathagar.org

কথায় বলে, 'এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি'। কথাটা সত্য, কথাটা সুন্দর, গ্রহণযোগ্য কথাও। তবে একটা 'কিন্তু' আছে। কিন্তুটা হলো এই, ভিন্ন ভৌগোলিক সীমানার দু'টি দেশের ভাষা যদি এক না হয়, এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের ভাষা যদি মোটেই না বুঝে, এমনকি এক শব্দও না বুঝে, তাহলে কোন্‌টা গালি আর কোন্‌টা বুলি, তা বুঝবে কেমন করে? এ ক্ষেত্রে গালি ও বুলির কথা প্রযোজ্য হয় না। যেমন চীনের ভাষা আমরা বুঝি না, চীনারাও আমাদের ভাষা বুঝে না। এ ক্ষেত্রেও গালি আর বুলি বুঝার সাধ্য নেই চীনাদের ও আমাদের। উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য হয় একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে।সেটা ভিন্ন দেশই হোক না কেন। তবে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, শব্দের ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষণীয়। ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা বলেন, একই ভাষাভাষী দেশের প্রতি ১২ মাইল অন্তর ভাষার পার্থক্য ধরা পড়ে।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য যে লক্ষ্য করা যায়, তাই নয়। লোকাচার, কৃষ্টি ও চাল-চলনেও পার্থক্য দেখা যায়। ভাষা ও কালচারের এই ব্যবধান প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে আলোচনা জমবে ভাল, কিন্তু কোন কোন এলাকার লোক নাখোশ হতে পারেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেও ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকা স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের ওপর ব্যাখ্যার দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম। এবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল প্রচলিত একটা অভ্যাস নিয়েই আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে, বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, বিশেষ করে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি। এ প্রদর্শন তখনই করা হয়, যখন বিজয়ের সংকেত দেখানো হয়। পশ্চিমা দেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয় বিশেষ এক ঐতিহ্য হিসেবে। কয়েকশ' বছর ধরে এ ঐতিহ্য অনুশীলিত হচ্ছে।

কখন থেকে এবং কোন্ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই রেওয়াজ চালু হলো পশ্চিমা

www.nagorikpathagar.org

দেশে, তা আমি অনেক বই-পুস্তক ঘাটাঘাটি করেও পাইনি। ইতিহাসের ছাত্র বলতে যে সব গুরুজনকে বুঝায়, তাদের ২/৩ জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তারাও এ ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারেননি। তবে একজন বললেন, খ্রিস্ট সমাজের রুসুম-রেওয়াজ সম্পর্কিত একটি পুস্তকে যৎ সামান্য যে ইঙ্গিত ইশারা পাওয়া গেছে, তা ঐতিহাসিক দলিল নয় বটে, কিন্তু একটা ভিত আছে, যুক্তি আছে, ভিত্তিও আছে। সেই ইঙ্গিত-ইশারা হচ্ছে এই, তাতে দু'টি অভিমতের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই, কোন এক ক্রুসেডে খ্রিস্টানদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তদানিন্তন খ্রিস্ট সমাজ। এ উপলক্ষে বিজয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের কোন কোন কর্মকর্তা দু'টি হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী তথা বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশে প্রদর্শন করে এ কথাই বুঝালেন যে, মুসলমানরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, তারাই বিজয় কেড়ে নিয়েছেন।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন প্রতিপক্ষের উদ্দেশে এক ধরনের উপহাস এবং সাথে সাথে এ প্রদর্শন বিজয়সমূচক প্রদর্শন। বাস্তবেও তাই। যতটা তা বিজয়সূচক তার কয়েক গুণ বেশি নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন। আর এর মধ্য দিয়ে উপহাসসূচক মোজাহেরা হয়ে যায়।

আর একটি অভিমত হচ্ছে এই, মুসলমানদের থেকে স্পেন কেড়ে নেয়ার পর স্পেনে যে বিজয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুষ্ঠানে শত্রুর উদ্দেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের রেওয়াজ শুরু হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয় মুসলমানদের উদ্দেশেএবং পরাজিত স্পেনের মুসলিম শাসকদের উদ্দেশে। প্রকারান্তরে নিজেদের বিজয় ঘোষণাও এ প্রদর্শন দ্বারা হয়ে যায়।

যে সময় থেকে এবং যে স্থান থেকেই এর শুরু হোক, প্রকৃত সত্য যে এই, বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন মানে শত্রুর মুখে ছাই, শত্রু নিপাত যাক, শত্রুর পরাজয় আর তাদের বিজয়। মনোভাবটা এই 'ড্যামকেয়ার'। অর্থাৎ 'শত্রুর মুখে মারলাম ছাই,

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখে বুঝে নাও তাই'। হিংসার বহিঃপ্রকাশ, উপস্থাপনের প্রতীকী রূপ, এর দ্বারা কেমন হিংসুটে একটা চেহারা ফুটে ওঠে। কেউ কেউ বলেন, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো আর পা দেখানো একই কথা।

তাদের কৃষ্টি এ হতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য তা এক ধরনের অপকৃষ্টির শামিল। ঐ যে কথা, এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনকে এই উপমহাদেশের মানুষ গ্রহণ করে নেয়নি, তারা মনে করেন, এ মস্তবড় এক বেয়াদবি। আমাদের সমাজে এই বেয়াদবি মোটেই বরদাস্ত করা হয় না। একজন অপরজনকে যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, তাহলে নিশ্চিত একটা গন্ডগোল বাধবে, ফৌজদারী মামলার ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে যাবে, মামলাও হতে পরে। আমাদের সমাজে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন শুধু বেয়াদবি নয়, যাকে প্রদর্শন করা হয় তিনি রীতিমত একে অপমানকর মনে করেন। দু'চারটা ফাউল কথা শুনতে তিনি রাজি, কিন্তু কারো বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখতে রাজি নন। সামনাসামনি একজনের ধমকের জবাব অন্যজন দেন বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া করে, অর্থাৎ ড্যামকেয়ার।

সুতরাং বলা যায়, এক দেশে যা আচার, কৃষ্টি, সভ্যতা, অন্য দেশের মানুষের কাছে তা বিপরীত অর্থ ও ভাব-ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করা হয়। একইভাবে আমাদের অনেক কিছুই ভিন্ দেশে ভিন্ সমাজে, ভিন্ সভ্যতার মানুষের কাছে বিপরীত অর্থে হয়তো গ্রহণ করা হয়।

আমরা কেন বাইরে যাবো? ঘরের মধ্যেই স্বজাতি ও স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নানা ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। তবে ভুল বুঝাবুঝি ঠিক বলা যায় না, ইচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্র বিন্দু থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমি অনেক মুসলমান তরুণ-যুবককে দেখেছি বাম বা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বিজয়সূচক হিসাবে ব্যবহার না করলেও অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করতে। যেমন একজন কোন এক পথের ঠিকানা জানতে চাইলেন অন্যজনের কাছে। যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি

www.nagorikpathagar.org

পশ্চিমা সংস্কৃতিপন্থী হলে বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া করে পথ নির্দেশ করবেন। সাধারণ আলাপ-আলোচনায় এ অঙ্গুলি ব্যবহার করতে আমি অনেককে দেখেছি। অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) নির্দেশনার প্রয়োজনে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। কখনো তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যবহার করে কোন নির্দেশনা দেননি।

মুসলমানদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারেও দ্বীনি সীমানা ও নির্দেশনা রয়েছে। উচ্চস্বরে কথা বলার দ্বীনী অনুমোদন নেই। নিম্ন স্বরে কথা বলতে হবে, জিহ্বাকে তথা জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অট্টহাসি কোন অবস্থাতেই দেয়া যাবে না। মুসলমানদের জন্য অট্টহাসি নিষিদ্ধ। জুতা পরতে বা জুতা খুলতে ডান না বাম পা আগে, টয়লেটে গেলে বা টয়লেট থেকে বের হতে গেলে কোন পা আগে যাবে বা বের হবে, সে নির্দেশনাও ইসলামে রয়েছে। ওজুর বেলা কোন্ অঙ্গ আগে ধুতে হবে, ডান-বাম চিহ্নিত করে ক্রমিক ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। এসব আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত।

'এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি' সব সময় সঠিক নয়। এক দেশের বা একটি অঞ্চলের কোন কোন বুলি অন্য দেশের বা অঞ্চলের গালি হতে পারে, সকল বুলি অন্য দেশে বা অঞ্চলের গালি হয় না। একইভাবে বলা যায়, একই দেশের কোন অঞ্চলের স্থানীয় কৃষ্টির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কৃষ্টির কিছু না কিছু তফাত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আচার অনুষ্ঠানেও কিছুটা হলেও অমিল থাকে।

যদি একই দেশের কোন কোন বুলি অন্য দেশের গালি হয়ে থাকে, আর ভিন দেশের কোন গালি আমাদের দেশের মানুষের জন্য বুলি হয়ে থাকে, তাহলে এই সূত্র ধরে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, এক দেশের জন্য যা সংস্কৃতি, আমাদের দেশের জন্য তা অপসংস্কৃতি হতে পারে। আমাদের সংস্কৃতি হয়তো তারা অপসংস্কৃতি বলে গণ্য করে, যদি দ্বীন ধর্ম ভিন্ন হয়। যেমন বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে তারা গৌরবের কথা, সাফল্যের কথা, বিজয়ের কথা ঘোষণা করে এবং

www.nagorikpathagar.org

একে তারা নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছে, আমরা তাদের এই কালচারকে বলি বেয়াদবি, অসভ্যতা ও অপকৃষ্টি।

গালি আর বুলির একাডেমিক আলোচনাও দরকার, তা ভাষা পন্ডিতদের পরিধিভুক্ত, আমার নয়। আমি এই সূত্র ধরে আমাদের সংস্কৃতির ভান্ডারে কিছু যোগ করতে পারি কিনা, সেই আহরণ প্রচেষ্টায় সচেষ্ট থাকতে চাই। আর এ কারণেই আমি আগেই বলেছি এবং বরাবর বলে আসছি বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এক নয়, এক হতে পারে না এবং কখনো এক হয় না। ওদের বৃদ্ধাঙ্গুলি আছে, আমাদেরও আছে। তারা ব্যবহার করে যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে, আমরা ব্যবহার করি সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে। এ জন্য বলছি, সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতির বাছবিচার আছে, আছে বিশেষ মাপকাঠি। যেমন ধরুন, আমাদের দেশের স্বধর্মী বামপন্থীরা যখন বলেন, 'অপসংস্কৃতি থেকে সাবধান', ডানপন্থীরাও বলেন, 'অপসংস্কৃতি থেকে সাবধান', তখন সাধারণ মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়, বুঝতে পারে না পরস্পর বিরোধী দু'টি পক্ষের একই বুলি কেমন করে হয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে? জটিল প্রশ্নই বটে, তবে একটু চিন্তা করলে এই জটিলতা আর থাকে না। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে এই, 'এক দেশের গালি আর অন্য দেশের বুলি' বাক্যটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে যদি দেশজ করি, তাহলে বলতে পারি, বামপন্থীদের জন্য যা গালি বা বুলি তা ডানপন্থীদের জন্য বিপরীত। তারা যাকে অপসংস্কৃতি বলছে, তা আমাদের জন্য সংস্কৃতি আর আমরা যাকে বলি অপসংস্কৃতি, তাকে তারা বলে সংস্কৃতি। একই দেশে একই সমাজে এই বিভক্তি রেখা। খ্রিস্টানদের সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে আদব লেহাজের লড়াই করি কোন মুখে? নিজ ঘরেই বিপরীত অবস্থা।

এ জন্যই বলছি, একই দেশে, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, একই ভাষাভাষী লোকের মধ্যে চিন্তা ও চৈতন্য ও আদর্শের খুব বেশি ফারাক থাকার কারণে গালি ও বুলির সংঘাত চলছে নিরন্তর অভিন্ন চৌহদ্দিতে। আদর্শিক ফারাক বেশি

www.nagorikpathagar.org

বলে চাল-চলন, বুলি বচন ও চরিত্রে ভিন্ন আদর্শের প্রভাব পড়ে। আদব-কায়দা, লেহাজ-তমিজ, কথাবার্তা, বলার স্টাইল, বক্তব্য উপস্থাপনের টেকনিক, বক্তব্য ভার-ভারিক্কী রাখা, শব্দ প্রয়োগে পরিশুদ্ধ স্বকীয় সংস্কৃতির দিকে খেয়াল রাখা, সচেতন হয়ে লেখা ও উচ্চারণ করা এবং অনুরূপ আরও বহু ক্ষেত্রে স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি খেয়াল রেখে চলা, কথা বলা, লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নেয়ার বা প্রশিক্ষণ দানের কোন ইন্সটিটিউশন নেই। আমাদের দেশে, এমনকি বিদেশের কোথাও। এসব শিখতে হয়, জানতে হয় পরিবার থেকে, তবে শর্ত হচ্ছে এই, পরিবারের মুরব্বীবৃন্দের হতে হবে একটি আদর্শে বিশ্বাসী। তাহলে পরিবারের শিশু-তরুণদের ওপর পড়বে সে আদর্শের ছায়া। আমাদের দেশে আদব-কায়দা বা লেহাজ-তমিজ শিখবার বা শিখাবার অনেক বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া আছে তবে কোন প্রক্রিয়াই ইন্সটিটিউশনাল নয়। ইন্সটিটিউশন বলা যায় পরিবারকে। যে পরিবারে নেই নৈতিক কোন আদর্শ, দ্বীনি চেতনা, ঈমান, যে পরিবার ফ্রি স্টাইল, সে সব পরিবার থেকে যে সব সন্তান বের হয় তারা সে অনুযায়ী হয়। আমার বিশ্বাস, সব কিছুর গোড়ায় পরিবার। পরিবার যেমন গড়ে ওঠে, সে পরিবার থেকে যা উৎপন্ন হয়, তারা পরিবারের আদর্শে গড়ে ওঠে। এ জন্যই বলেছি, গালি আর বুলি চিহ্নিত করার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে না, নিজ দেশে, নিজ সমাজে এমনকি নিজ পরিবারেও দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

গালি আর বুলি পরখ করার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, নিজ দেশ, নিজ সমাজই যথেষ্ট। আমার ঈমান আর ঐতিহ্যই পরখ করে দেবে কার কোন্ বুলি আমার জন্য গালি। শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যে আমাদের অবস্থান, তাই নয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। ওদের সমকামিতা, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর শরীরী ব্যবহার, লিভিং টুগেদার, জারজ সন্তানের উৎপাদন, বেলাল্লাপনা, যৌন

www.nagorikpathagar.org

জীবনধারা, মদ মাদকে বুঁদ হয়ে থাকা, কুত্তা স্টাইলে প্রশ্রাব করা, ওদের সন্ত্রাসী সংজ্ঞা, ওদের শান্তি ফর্মুলা, ওদের পারিবারিক বিধি বিধান, আহার-বিহার আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী, আমাদের মূল্যবোধের খেলাপ, আমাদের ধ্যান-ধারণার খেলাপ। তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বক্রিল গতি সর্পবৎ, বিষাক্ত দংশন। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন তন্মধ্যে একটি। ওদের সংস্কৃতির ওপর আমরা লাহাওলা পড়ি।

www.nagorikpathagar.org

কিছু তথ্য

['কিছু তথ্য' শিরোনামে তিনটি পৃষ্ঠায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম ও পরিচিতি দিলাম। বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী অনেকে নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে তা লালন করেন। এই অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আমাদের অন্তত একাডেমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন বাছ-বিচারের তাগিদে।]

www.nagorikpathagar.org

আল্পনা :

আলিপনা, সংস্কৃতি আলেপন : প্রাচীনকালে পানিতে চাউলের গুঁড়া গুলিয়ে গৃহ এবং দেবতা মণ্ডপ প্রভৃতি স্থানে মঙ্গলাচিত্র অংকনের নাম ছিল আল্পনা। এখনও তা আছে। তবে আধুনিক কালেও বহু হিন্দু পরিবারে এ রেওয়াজ চালু আছে। এখন কোন কোন আধুনিক হিন্দু পরিবারে বাজারের দামী রঙ-তুলি ব্যবহার করে আল্পনা অংকন করেন। পরকীয়া কৃষ্টি-পছন্দ কোন কোন আধুনিক মুসলিম পরিবারেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষত বিয়েতে এই মঙ্গলাচিত্র আঁকা শুরু করেছেন। বাংলাদেশের আধুনিক ইসলাম বিমুখ মুসলিম পরিবারে মঙ্গলা দেবীর প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। 'মঙ্গল প্রদীপ আর অগ্নিশিখা' নিবন্ধ এবং 'মঙ্গলা' শিরোনামের আলোচনা পাঠকদের পাঠ করার অনুরোধ করছি।

উলুধ্বনি :

শুভ কর্মে হিন্দু নারীগণের উচ্চারিত মঙ্গলধ্বনি। সংস্কৃত শব্দ হুলধ্বনি। সন্ধ্যার সময় হিন্দু মহিলারা শুভ কামনায় উলুধ্বনি দিয়ে থাকে।

মঙ্গল/মঙ্গলা- শুভদায়িনী, দুর্গা।

মঙ্গল গীত- দেব মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গান।

মঙ্গল ঘট- মঙ্গল কলস বা মঙ্গল ঘট। মঙ্গল কামনায় স্থাপিত ডাব আম্রপল্লব প্রভৃতিতে পরিশোভিত-পানি পূর্ণ কলসি বা ঘট।

মঙ্গল পূজা- দুর্গাকে পূজা।

মঙ্গল স্নান- মঙ্গল পূজার আগে মঙ্গল কামনায় যে স্নান, তা মঙ্গল স্নান।

মঙ্গল শোভাযাত্রা- শুভদায়িনীর কাছে শুভ কামনায় যে শোভা যাত্রা করা হয়, তা মঙ্গল শোভা যাত্রা। বাংলা নববর্ষে ও বসন্ত বরণে ঢাকায় মঙ্গল শোভা যাত্রা বের হয়।

মঙ্গল প্রদীপ- শুভদায়িনীর কাছে শুভ কামনায় তাকে স্মরণ করে যে প্রদীপ জ্বালানো হয়, তা মঙ্গলপ্রদীপ।

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত তীর্থ শীর্ষক কবিতার শেষ তিনটা পঙ্‌ক্তি হলো এই : মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা/ মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা/ সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীড়ে/ আজি ভারতের মহামানব তীরে। কোন্ 'মার' অভিষেকে, 'মা' আনন্দময়ীর'? 'মা' আনন্দময়ী দুর্গা। শিবের স্ত্রী।

মঙ্গল প্রদীপ সংক্রান্ত খবর :

কথাশিল্পী শওকত ওসমানের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ৭ই জানুয়ারি, রোববার ১৯৯৬, সারাদিনব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব ৯৬' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরে একটি করে হিসাব করে আশি বছরের জন্য আশিটি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়।

মুনীর চৌধুরীর জন্ম দিনে মঙ্গল প্রদীপ :

মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর সোমবার মুনীর চৌধুরীর ৭০তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। একই সাথে পালিত হয় বাংলা মঞ্চ নাটকের দু'শ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। পাবলিক লাইব্রেরি হলে এক থিয়েটার আয়োজিত অনুষ্ঠান ঢোলক বাদ্য বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন (ওদের ভাষায় পৌরহিত্য করেন) মুনীর চৌধুরীর ভাই কবীর চৌধুরী। শিবের নৃত্য ভঙ্গিমায় তৈরি প্রতিকৃতি গাঁদা ফুল নিয়ে সাজানো সেখানে তিনটি মেয়ে মঙ্গল প্রদীপ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে আসে। প্রদীপগুলো রাখা হয় বেদীমূলে। অতঃপর অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বিচারপতি জনাব হাবিবুর রহমানের হাত দিয়ে তা জ্বালানো হয়। অনুষ্ঠানে রামেন্দু মজুমদারকে (মুনীর ও কবীর চৌধুরীর ভগ্নিপতি) ২৫ হাজার টাকা 'মুনীর চৌধুরী সম্মান' পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ফেরদৌসী মজুমদারের (রামেন্দু মজুমদারের স্ত্রী) নির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

র‍্যাগ ডে :

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের আতিশয্যে রঙ মেখে, মাইকে অশালীন গান গেয়ে, শব্দ করে, বিচিত্র পোশাক পরিধান করে এবং ছাত্রছাত্রীরা দল বেধে নানা অঙ্গভঙ্গি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করে থাকে। পটকা ফাটিয়ে এলাকা

www.pathagar.com

রীতিমত কাঁপিয়ে তোলে। অনেক সময় র‍্যাগ ডে পালনকারীরা এমন বাড়াবাড়ি করে যার ফলে পথচারীরাও নানাভাবে আক্রান্ত হয়। শিক্ষার সংস্কৃতি নামে এই র‍্যাগডে বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে কয়েক দশক থেকে উদযাপন হয়ে আসছে। তাদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে যথেষ্ট লেখালেখি হলেও এখনও এই দিবস উদযাপনের বিচিত্র স্টাইল অনিয়ন্ত্রিত।

রাখী :

বিপদ থেকে রক্ষা কামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে যে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়া হয়, শ্রাবণ পূর্ণিমায় প্রিয়জনের রাখী বেঁধে দেয়ার নাম রাখী বন্ধন।

রাখি বন্ধন ও তিলক সংস্কৃতি :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিলক ও রাখি বন্ধন সংস্কৃতি প্রবেশ করে ১৯৯৯ সালে। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবর ছিল এই 'ভারত থেকে তিলক ও রাখি বন্ধন সংস্কৃতির আমদানি' হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাও আবার ক্লাস উদ্বোধন করতে গিয়ে। ১৯৯৯ সালের ২রা অক্টোবর শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে ১ম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে প্রত্যেক বিভাগের পক্ষ থেকে নবীণ ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় শুধু সাংবাদিকতা বিভাগে। এই বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের বরণ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে হাতে রাখি বন্ধন এবং কপালে তিলক লাগাতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান (তিনি মুসলমান) নিজেকে অতি ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আমদানি করেন।

অপসংস্কৃতির বিভিষীকা-২য় খন্ড এখানেই সমাপ্ত

পারিবারিক গ্রন্থাগার

পারিবারিক গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

"স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অপসংস্কৃতি কি? আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিনা। আমার মতে অপসংস্কৃতির কোন আন্তর্জাতিক বা সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নেই। শৃংখলার বিপরীত যেমন উচ্ছৃংখলতা, আদবের বিপরীত যেমন বেআদবী, আইনের বিপরীত যেমন বেআইনী, সুস্থ চিন্তার বিপরীত যেমন পাগলামী আর সভ্যতার বিপরীত যেমন বর্বরতা, তেমনি সংস্কৃতির বিপরীত যা কিছু আছে, সবই অপসংস্কৃতি। বিভ্রান্ত চিন্তার উদভ্রান্ত খেয়ালের অতৃপ্ত মনের ইবলিসী প্রোগ্রামের বাস্তব অনুশীলনকে অপসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। মানুষের সুপ্ত দুর্বল অনুভুতিগুলোকে উজ্জীবত করে যে রঙ রসের তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়, সেই তরঙ্গের বিভিন্নমূখী প্রকাশের সামগ্রিক অবস্থাকেও অপসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা যায়। পরিশীলিত ও মার্জিত চিন্তা চেতনা তথা মন মানসের বিপরীত যা কিছু আছে, সবই আমি অপসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করি। তাহলে সংস্কৃতি কি? হাঁ, সংস্কৃতির সংজ্ঞা আছে, ব্যাখ্যাও আছে। সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার শব্দ থেকে এসেছে। মার্জিত পরিশীলিত মানসিকতাই সংস্কৃতি। সংস্কারের আগুনে খাদ বের হয়ে যা থাকে তাই সংস্কৃতি। সংস্কারের রকমফেরও রয়েছে। সংস্কারের ভিত্তি সকল জাতির কিন্তু এক নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী সংস্কারের ভিত্তি রচিত হয়। সংস্কারের ভিত্তি যে জাতির যেমন, সে জাতির সংস্কৃতি আর তার বিকাশও তেমন। সুতরাং সকল সংস্কৃতির ভিত্তি কিন্তু একটা নয়। প্রখ্যাত লেখক Clive beel তার Culture পুস্তকে বলেছেন, The Civilized man is made, not born কিন্তু আমার প্রশ্ন, গঠনের ভিত্তিটা কি এবং ভিত্তি রচনার উপাদানই বা কি? আমি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, ওহীর জ্ঞান যে জাতির কাছে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সংরক্ষিত, একমাত্র তারাই সংস্কারের নির্ভেজাল উপাদানে সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করতে পারে। যাদের কাছে সেই জ্ঞান নেই তারা চতুর্দিকে হাত বাড়ায়।"

Design : Digital Graphic & Printers, Tel : 8353908

একমাত্র পরিবেশক

তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১ বড় মগবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৮৩৫৪৩৬৮, ০১৭২-০৪৩৫৪০